আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ - ১

দারুল উলুম দেওবন্দ

পূর্বসুরি ও উত্তরসুরি

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

আকাবিরে দেওবন্দের উপর আরোপিত আপত্তির জবাব সিরিজ- ১

দারুল উলূম দেওবন্দ
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি

গ্রন্থকার

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুস সিদ্দীক

পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী

দারুল উলূম দেওবন্দ
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি
মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

প্রকাশকঃ
হাবিব বিন আব্দুল হাকিম

প্রকাশকালঃ
ডিসেম্বর- ২০১৬ ইং
ডিসেম্বর- ২০১৬ ইং
মার্চ- ২০১৭ ইং

বর্ণবিন্যাস
সূর্যের হাসি কম্পিউটার্স

মূল্য : ১১০.০০ টাকা

যে কারণে বইটি পড়বেন.....

“আমি আবারও বলছি, দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীনী ইলমের চর্চা বিষয় দুটিকে আলাদা করতে পারলে এ সত্যটি বুঝতে আরো সহজ হবে”। [পৃঃ- ১৩]

“কারণ দ্বীন সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ও ‘মাসূর’-অনুসৃত পদ্ধতি ছিল পর্যায়ক্রমে দাওয়াত, জিহাদ, বিজয়, শাসন ও প্রশাসন -যা একটি ভূখণ্ডের সকল নাগরিককে ছুঁয়ে যায় এবং কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না, আড়াল করে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না; বরং দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে প্রতিযোগিতাপ্রবণ হয়ে ওঠে”। [পৃঃ- ১৬]

“ভারত উপমহাদেশে দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক দ্বীন চর্চার সবচাইতে বড়, ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্র হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ। এর সমকক্ষ দ্বিতীয়টি আর নেই”। [পৃঃ- ২২]

“একটি মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন চিন্তা-চেতনা বা কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কখনো মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের উপর বর্তায় না”। [পৃঃ- ৩১]

“সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলো উত্তরসূরিদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দেয়, অজুহাতের রাস্তা খোলে না। শত্রুর জন্যও না, মিত্রের জন্যও না”। [পৃঃ- ৪৫]

“সময় ও মেধার যোগানদাতারা সময় ও মেধাকে ইলমের পেছনে ব্যয় না করে অর্থযোগানদাতার পেছনে ব্যয় করছেন”। [পৃঃ- ৮৩]

“প্রজন্মের মেধার অধিকারীরা ও মেধার যোগানদাতারা ন্যূনতম জীবন যাপনের জন্য উপার্জনের বৈধ ও সম্মানজনক পদ্ধতিগুলোর পেছনে সময় ব্যয় না করে সে সময়টুকু বা তার চাইতে বেশি সময় ব্যয় করেছেন অর্থ যোগানদাতাদের পেছনে”। [পৃঃ- ৮৫]

"আসলে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে জীবনের একটি মান আগেই কল্পনা করে ঠিক করে ফেলেছি। এর পর সে কাল্পনিক মানকে রক্ষা করা জরুরী মনে করেছি। এর পর সে কাল্পনিক জরুরত পুরা করার জন্য হারাম গ্রহণকে বৈধতা দিয়ে দিয়েছি"। [পৃ:- ৮৯]

"সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে হবে"। [পৃ:- ৯৫]

এতে যা আছে..........

একান্ত আলাপন

নিজের অনুভব-অনুভূতি আঁকতে গিয়ে ভুল হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকার কারণেই বড়দের দরবারে ধরনা দিয়েছিলাম। বড়রা যেহেতু এর চাইতে বড় কাজে ব্যস্ত তাই সময় দিতে পারেননি, বা সময় দেয়ার মত আগ্রহ অনুভব করেননি, বা প্রয়োজন মনে করেননি। যাই হোক, যেহেতু বড়দের অনুমোদন ছাড়াই অনুভূতিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে তাই দলিলভিত্তিক যে কোন সম্পাদনার কাজ আসলেই বাকি রয়ে গেছে।

আমিতো আমার আবেগ তুলে ধরলাম, দলিলের প্রতি খুব নজর দেয়ার মানসিকতা ছিল না। এ ছাড়া আবেগ প্রকাশ করার জন্য না দলিল লাগে, আর না উপযুক্ত বয়স লাগে, আর না উপযুক্ত যোগ্যতা লাগে। কিন্তু সম্পাদকগণ অবশ্যই দলিলের আলোকেই সম্পাদনার কাজটা সম্পাদন করবেন বলে আশা করছি। আমাকে অবগত করতে কষ্ট স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই এবং করেও খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ সম্পাদকের দলিলভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদনাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। সম্পাদনার কাজ চলতে থাকবে আর আমি ও আমরা তা থেকে উপকৃত হতে থাকব। এটাই যথেষ্ট।

কিছু কথা বড়দের সামনে গুছিয়ে বলতে পারি না। একটা বলতে গিয়ে আরেকটা বলে ফেলি। আবার এক কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই ছুটে যায়। যার দরুন চোখ রাঙ্গানী আর ধমকের ভয়ে মূল প্রশ্ন হারিয়ে প্রায়ই লজ্জিত হয়ে ফিরেছি। ভাগ্যক্রমে বড়দেরকে আমরা অনেক বড় পেয়েছি। আর আমরা স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশি ছোট। ক্ষুদ্র জীবনের অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন, অপর্যাপ্ত অনুশীলনের কারণে পঠিত বিদ্যাকে বাস্তব জীবনের যেখানে যেখানে প্রয়োগ করতে চেয়েছি সেখানে সেখানে প্রয়োগ করতে পারিনি। কেন পারিনি তাও খুঁজে পাইনি।

তাই অনুভূতিগুলো নিষ্প্রাণ কাগজের পাতা ও কালির কাঁধে তুলে দিলাম। প্রথম ঝাপটা নিষ্প্রাণ দেহের উপর বয়ে যাক। ততক্ষণে হয়ত আমরা কিছুটা সাহসী হয়ে উঠব। অথবা বড়রা আমাদের অসহায়ত্বকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। আমীন।

-যুবায়ের

দারুল উলূম দেওবন্দ
পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি

بسم الله الرحمن الرحيم

মূল্যায়ন পদ্ধতি

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াবিকা নাস্তাঈনু ইয়া রাব্বী, ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিকাল কারীম। 'দারুল উলূম দেওবন্দ' আমাদের মানসপটে সে অনুপাতেই বিস্তৃত যতটুকু মনের সামর্থ্যে রয়েছে। যার ফলে প্রত্যেক ভাবুক ও গবেষক এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত পরিধিকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না।

তথ্য-উপাত্তের আলোকে হয়তো এর একটি পরিচয় তুলে ধরা যাবে, যেমন 'মাদরাসা পরিচিতি' শিরোনামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরা হয়। কিন্তু এর দ্বারা দারুল উলূম দেওবন্দের দালান-কোঠা ও আয়তনসহ আরো বহু তথ্যের সঠিক বিবরণ তুলে ধরা গেলেও দ্বীনের এ দুর্গকে আমি কীভাবে বুঝেছি তা হয়তো তুলে ধরা যাবে না।

তাই আমার মত করেই আমি দারুল উলূম দেওবন্দকে তুলে ধরতে চাই। এতে ভুল-শুদ্ধের সকল দায় দায়িত্ব আমার উপরই থাকল। আল্লাহ কবুল করুন। সঠিক উপলব্ধি দান করুন। আমীন।

এক.
বিশ্ব সভায় দক্ষিণ এশিয়া

পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া বা ভারত উপমহাদেশ, সে বৃহৎ ভুখণ্ডের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের কর্ণধারগণ তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যের বহু কথা, বহু গল্প লিখে গেছেন এবং লিখে চলছেন। প্রত্যেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতিরাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তারাই শ্রেষ্ঠ, তাদের মাটিই শ্রেষ্ঠ, তাদের বাতাসই বেশি স্বচ্ছ, তাদের আকাশই বেশী নীল, চাঁদের যে পিঠে সবচাইতে বেশি আলো সে দিকটা তাদের দিকে ফেরানো এবং তারকারাজীর বড় ভাগটা তারাই

পেয়েছে। ঐতিহ্য-অবদানের বিকিরণ ছড়াতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী মোরগের লড়াই, মহিষের যুদ্ধ, কাদা ছোড়া উৎসব ও বুড়ির নাচন ইত্যাদি নিয়েও বড় বড় কিতাব লিখে ফেলেছেন অনেকে।

কিন্তু এমন জ্ঞান-গরিমার অপদার্থ গর্বিতরাও হাজার, দেড় হাজার, দুই হাজার বছরের ইতিহাস মন্থন করে, মাটি চেলে, পানি ছেঁকে জ্ঞানচর্চার এমন কোন চিত্র আঁকতে পারেনি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন ভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারেনি, যা দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায়। ইসলামী জ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই এ অবস্থার কোন তারতম্য ছিল না।

এ বাস্তবটুকু স্বীকার করে নিতে মর্যাদাহানীর সমস্যা ছাড়া আর বড় কোন বাধা আছে বলে আমার মনে হয় না। যা সত্য তা স্বীকার করতেই হবে। এটাই নিরাপদ। হ্যাঁ আল্লাহপ্রদত্ত বহু নেয়ামতের অধিকারী ছিল এ ভূখণ্ড, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। যার ফলে বহুরূপী ও বহুমুখী লোলুপ দৃষ্টির শিকার হতে হয়েছে তাকে। সে লালসাজলের ছোবল থেকে এ ভূখণ্ড, এ সম্প্রদায় কখনো মুক্তি পায়নি।

দুই.
বিশ্ব মুসলিমসভায় দক্ষিণ এশিয়া

ইলমে দ্বীন তথা ইলমে ওহীর সাথে এ ভারত উপমহাদেশের পরিচয়টা বাস্তবেই বহু দেরিতে হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় হয়তোবা এ ভূখণ্ডে সাহাবায়ে কেরামের আগমনও প্রমাণ করা যাবে। নৌপথে উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সাহাবা তাবেয়ীনের পদচারণা খুব যুক্তিসঙ্গত দাবি। উমাইয়া খেলাফত আমলে এতদাঞ্চলে মুহাম্মদ বিন কাসেমের বিজয়াভিযানও খুব আলোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়। এতসব কিছুর পরও এটাই সত্য যে, এ ভূখণ্ডটি ইলমে ওহীর যথার্থ পরিচর্যা পায়নি। আর ইলমে ওহীর পরিচর্যাহীন এ মেয়াদও বহুকালের।

কারণ, উপমহাদেশের বিশাল আয়তন, জনসংখ্যার আধিক্য, উপরন্তু প্রাচীন ধর্ম-অধর্মের অসভ্যতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য, নতুন

বীজ বপনের জন্য এবং সবুজ ভূমি উদ্ভাবন করে বসন্তের হাওয়া প্রবাহের জন্য উপরোল্লিখিত পদচারণাগুলো ছিল তপ্ত-মরুভূমিতে এক ফোঁটা পানির মত, যা পিপাসা বাড়াতে পারে, মিটাতে পারে না।

যে ভূমির চাহিদা ছিল সকাল-সন্ধ্যা পরিচর্যার, সে ভূমি শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল পর্যন্তও একজন রাহবারের দেখা পায়নি। কোথাও পেয়েছে তো কোথাও পায়নি। একটি প্রজন্ম পেয়েছে তো আরেক প্রজন্ম পায়নি। কেউ মূল পেয়েছে তো কাণ্ড পায়নি। আবার কেউ ডাল পেয়েছে তো মূল পায়নি।

এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীনী ইলমের চর্চা বিষয় দুটিকে আলাদা করতে পারলে এ সত্যটি বুঝতে আরো সহজ হবে। **আমি আবারও বলছি, দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীনী ইলমের চর্চা বিষয় দু'টিকে আলাদা করতে পারলে এ সত্যটি বুঝতে আরো সহজ হবে।**

উদাহরণ-স্বরূপ কুফা-বসরা ছোট্ট দু'টি ভূখণ্ড। দ্বীনের দাওয়াত বহু আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। দাওয়াত ও জিহাদের কাজ তখন ইরানকে অতিক্রম করে চলেছে। কূফা-বসরার ছোট্ট ভূমিতে সীমিত সংখ্যক জনগণের মাঝে সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিও শত শত। এরপরও খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কূফায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের দ্বীনের পরিচর্যার জন্য, ইলমের চর্চার জন্য। এছাড়া আরো অনেককে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে কোন দ্বিধা থাকতে পারে না যে, আমাদের এ ভূখণ্ডটি বহুকাল যাবৎ আনুপাতিক হারে ইলমের চর্যা ও দ্বীনের পরিচর্যা থেকে অনেক দূরে ছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে তো এর কোন অবস্থান ছিলই না, ইলমের জন্য 'রিহলা' বা শিক্ষা সফরেরও ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ব্যাক্তিগত উদ্যোগে বা বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কেউ কেউ নিজেকে ইলমের জন্য ওয়াকফ করে থাকলেও এ বিশাল জনগোষ্ঠী ও ভূখণ্ডের জন্য তা কখনো যথেষ্ট ছিল না।

তিন.

সেতুবন্ধন

এক কালে এসে এ ভূখণ্ড ও এ জনগোষ্ঠী মুসলিম শাসকদের অধীনস্থ হয়েছে। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসতে শুরু করেছে। ইলমের উপায় উপকরণের আদান প্রদানের রাস্তা খুলেছে এবং ইলম চর্চার একটা আবহ তৈরি হয়ে ইলমের বাতাস বইতে শুরু করেছে। ইলমের কেন্দ্রসমূহ থেকে দ্বীনের ধারক বাহকগণের আগমন, আবার এ অঞ্চলের মুসলমানদের ইলম শেখার জন্য কেন্দ্রগুলোর দিকে সফর করা এ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মূল্যায়ন

এ পর্যায়ে এসে যে বাস্তবতাগুলো আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে তা হচ্ছে, ইসলামের কেন্দ্রীয় খেলাফত তথা খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে বনু উমাইয়া এবং খেলাফতে আব্বাসিয়ার স্বর্ণযুগে এ অঞ্চলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় খেলাফতের সংযোগ তৈরি হয়নি। যখন সংযোগ হয়েছে তখন কেন্দ্রীয় খেলাফত ছিল বহুধা বিভক্ত। খেলাফত তখন এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে চলছিল যারা দ্বীন ও দ্বীনী ইলমের খেদমত করেছেন বলা চললেও তাদেরকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের মাপকাঠি বলা চলে না।

উপরন্তু যেসব মুসলিম শাসক আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল তারা কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রতিনিধি ছিলেন না। কেন্দ্রীয় খেলাফতের রাষ্ট্রযন্ত্র এক পর্যায়ে দ্বীনের সঠিক মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লেও দ্বীনের ধারক বাহক ওলামায়ে কেরাম তখনও দ্বীনের সঠিক মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েননি। কিন্তু আমাদের মুসলিম শাসকবর্গ কেন্দ্রীয় খেলাফতের প্রতিনিধি না হওয়ার কারণে দ্বীন ও ইলমের রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং মুসলিম বিশ্বের সকল অঙ্গনের দ্বীনের প্রহরী ওলামায়ে কেরাম থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল।

আমাদের মুসলিম শাসকবর্গ ছিলেন স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠাকারী কোন ক্ষমতার অধীনে, বা কেন্দ্রীয় খেলাফতের সঙ্গে বিদ্রোহকারী কোন শাসকের অধীনে অথবা ভিন দেশী ইসলামের শত্রুর ঘরে জন্ম নেয়া কোন মুসলমান

শাসকের অধীনে। যে শাসকবর্গের কাছে দ্বীন ও ইলম উত্তরাধিকারের সঠিক পদ্ধতিতে পৌঁছেনি।

এ শাসকবর্গ মুসলমান ও ইসলামের জন্য বহু অবদান রেখেছেন, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন -এসব কিছু মেনে নেয়ার পরও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, দ্বীনের বিষয়ে তাদের নিজস্ব কিছু বুঝ ছিল, জন্মসূত্র ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে যা থেকে মুক্ত হওয়া তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে সম্ভব ছিল না বা সম্ভব হলেও বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি।

যারা শিয়া মতবাদ থেকে জন্ম নিয়েছেন তারা এ মতবাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করেননি, আবার কেউ করলেও পারেননি। যারা শুধুই ক্ষমতাপ্রেমী-স্বৈরাচারী ক্ষমতাবানদের ঘর থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তারা তাদের হাজারো মহা গুণের সমাহার সত্ত্বেও দ্বীনের ও দ্বীনী ইলমের সঠিক মুখপাত্র হওয়ার যোগ্য হননি। যার ফলে এ সকল মুসলিম শাসক ইসলামী শাসনের সঙ্গে তাদের নিজস্ব আকীদা, রুচি, দুর্বলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থগুলোকে জুড়ে দিয়েছেন।

ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু তাদের ইলম এতটা প্রভাব বিস্তারকারী ছিল না যা শাসকের ভুল গতি-পথকে রোধ করতে পারে। দ্বীনের মূল অবয়বকে স্বচ্ছ রাখার জন্য যে অস্বাভাবিক সাহসিকতা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল, তা প্রদর্শন করা হয়নি। যার দরুন الناس على دين ملوكهم (রাষ্ট্র প্রধানের রীতি-নীতিই মানুষ গ্রহণ করে) -এরই অনুশীলন হয়েছে অনেক বেশি। দ্বীনের সঠিক বুঝের মধ্যে ঘাটতি রয়ে গেছে অনেক। ইলমের সঠিক চর্চা ও তার সঠিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই বাধার মুখে পড়েছে।

দেখুন, কুরআনের ধারাবাহিক সনদ রয়েছে, হাদীসের ধারাবাহিক সনদ রয়েছে, ফিকহের ধারাবাহিক সনদ রয়েছে, আজো পর্যন্ত বলবৎ আছে। এ

সনদের কোথাও বিচ্ছিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। এরকমভাবে দ্বীনের সহীহ ও সঠিক বুঝবৃক্ষেরও একটি সনদ রয়েছে যে সনদের সঙ্গে আমরা আমাদেরকে-ভারত উপমহাদেশকে যুক্ত করতে পারিনি। দীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতা এবং পরবর্তীতে সেতু বন্ধনের দুর্বলতা আমাদেরকে শতাব্দীর পর শতাব্দী দূরে রাখতেই সক্ষম হয়েছে।

চার.

প্রবাহ শুরু হয়েছে

এরপরও মুসলিম শাসন, শিক্ষার জন্য সফর, দ্বীনের দাঈগণের আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক গ্রন্থাবলীর আমদানি, আঞ্চলিক দ্বীনী চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিরোনামে গ্রন্থাবলী প্রণয়নের মাধ্যমে ঈমানের হাওয়া গতিশীল হয়েছে। তবে ঈমানের দাওয়াতের বিস্তৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে ঈমানের শিক্ষা ও ইলমে দ্বীন চর্চার যে আনুপাতিক হার বজায় থাকার দরকার ছিল তার শত ভাগের এক ভাগও থাকেনি।

কথাটি আমি আবারও বলছি, ঈমানের দাওয়াতের বিস্তৃতি ও গ্রহণযোগ্যতার সাথে ঈমানের শিক্ষা ও ইলমে দ্বীন চর্চার যে আনুপাতিক হার বজায় থাকার দরকার ছিল তার শত ভাগের এক ভাগও থাকেনি। আর তা সম্ভবও নয়। **কারণ দ্বীন সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ও 'মাসূর'- অনুসৃত পদ্ধতি ছিল পর্যায়ক্রমে দাওয়াত, জিহাদ, বিজয়, শাসন ও প্রশাসন -যা একটি ভূখণ্ডের সকল নাগরিককে ছুঁয়ে যায় এবং কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না, আড়াল করে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না; বরং দ্বীনী ও ইলমী বিষয়ে প্রতিযোগিতাপ্রবণ হয়ে ওঠে।**

আমাদের ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন, প্রচার ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে পাতা উল্টালে এ স্বাভাবিক ও মাসূর-অনুসৃত পদ্ধতিটি পাওয়া যায় না। তাই বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর সঙ্গে এ উপমহাদেশ ও এর মত ভূখণ্ডগুলোকে তুলনা করা চলে না।

এ সকল বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েও দাবি করা যায় যে, অনেক দেরীতে হলেও এ উপমহাদেশে ইলমের চর্চা হয়েছে। দ্বীনী ইলমের প্রায়

সকল বিভাগে কাজ করার মত এবং সকল বিষয়ে গবেষণা করার মত যোগ্য ব্যক্তিবর্গ তৈরি হয়েছেন। বড় বড় ইলমের শহর গড়ে উঠেছে। আস্থা রাখা যায় এমন গবেষণা কেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠেছে। গবেষণাধর্মী রচনাবলী তৈরি হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য হারেই তা জনসমক্ষে এসেছে। গোটা মুসলিম বিশ্বকে খোরাক দিতে পারে এমন রচনাসমগ্রও তৈরি হয়েছে। ঈর্ষার পাত্র হওয়ার মত অবদান মুসলমানের সামনে এসেছে। এ সত্য আমরা স্বীকার করি, গর্ব করি এবং পুরা মুসলিম বিশ্বকেই তা স্বীকার করতে হবে।

পাঁচ.

সমস্যার পাহাড় : সমাধানের আশা

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইলমে দ্বীনকে দ্বীনের মেজায অনুযায়ী চর্চা করার জন্য এ ভারত উপমহাদেশ সীমিত সময়ই পেয়েছে বলা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে দাঁড়ানোর পর্যাপ্ত মেয়াদ পাওয়ার আগেই এ ভূখণ্ডটি আবার শত্রুর কবলে পড়েছে। আর তা ছিল প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টানদের কবলে। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের শত্রু বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তারা কখনো বন্ধু হতে পারে না। তারা শত্রুতা করার জন্যই এসেছে এবং শত্রুতার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রেখেছে। ইতিহাস কম-বেশি আমাদের সবারই জানা আছে। দেশের সকল দ্বীনী অঙ্গনকে শরীয়ত বিরোধী অঙ্গনে রূপান্তর করা হয়েছে। ইসলামী নেতৃত্বকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

ইসলামী পরিচালনার অভাবে সবধরনের আগাছা গজিয়ে উঠেছে। মুসলমান বাদী-বিবাদীর বিচারকের ভূমিকা পালন করেছে উভয়ের শত্রু খ্রিস্টান। সরাসরি তাবশীর তথা ইরতিদাদের ফেতনার সাথে সাথে ইসলামের শিরোনামে ইসলামকে অস্বীকার করার বাজারও ছিল সরগরম। ইসলামের সঠিক পরিচয় থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখার জন্য সকল ব্যবস্থাই সম্পন্ন হয়ে গেছে। ইসলাম বিরোধী সকল বাতেল ও বাতেনী ফেরকা তাদের আত্মপ্রকাশের মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নিয়েছিল এ সময়কে এবং এ ভূখণ্ডকে।

নিজের মত করে দ্বীনের সংজ্ঞা তৈরি করা, যে কোন ফরয বিধানকে নির্দ্বিধায় অস্বীকার করা, কুরআন ও হাদীসের মুতাওয়াতির ও অকাট্য বিষয়গুলোকে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত চিত্রায়িত করা, আল্লাহর পরিচয়কে দেব-দেবীর আদলে তুলে ধরা, কেয়ামত ও জান্নাত-জাহান্নামকে কল্পনার শান্তি-অশান্তি বলে সান্ত্বনা লাভ করা, আল্লাহর উপর নবী রাসূলকে এবং নবী রাসূলের উপর আউলিয়া কেরামকে অধিক গুরুত্ব দেয়া, কুরআন-হাদীস-ইজমা ও কেয়াসের উপর স্বপ্ন, কাশ্‌ফ, মুরাকাবা ও কারামতকে প্রাধান্য দেয়া, কবরওয়ালার মালিকের বিপরীতে কবরওয়ালাকে প্রাধান্য দেয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো দ্বীনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে পড়েছিল এ জনগোষ্ঠী ও এ ভূখণ্ড।

বিষয়টিকে এভাবে ধরে নেয়া যায় যে, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ যেমন তার সকল বিভাগের সকল শক্তি হারিয়ে শুধুমাত্র অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে আছে এতটুকু জানান দেয়ার জন্য অতিকষ্টে নিঃশ্বাস ফেলে; ভারত উপমহাদেশে দ্বীনের হালত এবং দ্বীনের ধারক বাহকদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ বা তার চাইতে আরো শোচনীয়।

কুফরী শক্তি শতভাগ প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের ধারক বাহকগণকে ফাঁসিতে ঝুলানো সম্পন্ন হয়ে গেছে। ইসলামী ঐতিহ্যগুলোকে ধর্মদ্রোহীদের নোংরামীতে ভরে দেয়া হয়েছে। অপশিক্ষার জাল বিছানো হয়ে গেছে।

এমন এক নাযুক মুহূর্তে মানবতার ধর্ম ইসলামকে, ইসলামের শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখা ছিল দ্বীনের ধারক বাহকগণের সবচাইতে বড় দায়িত্ব। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন না করে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করে আবার হামলা করার প্রস্তুতি নেয়া ছিল সময়ের শ্রেষ্ঠ দাবি। বিধ্বস্ত এ দালানকে পুনঃনির্মাণ করা ছিল গুরু দায়িত্ব। **'দারুল উলূম দেওবন্দ' বা দেওবন্দ মাদরাসা ছিল সে বিনির্মাণের একটি দুর্গ, একটি সূতিকাগার ।**

ছয়.
প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক দু'টি উদ্দেশ্য

খ্রিস্টশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে করতে সর্বশেষ শামেলীর সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে কাফেলাটি إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة (যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন বা দলে স্থান লওয়া) এর আমল হিসেবে একটি দুর্গ তৈরি করেছিল, সে দুর্গটির নাম হচ্ছে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এবং সে কাফেলাটির নাম হচ্ছে 'দেওবন্দী'।

এ কাফেলা এবং এ দুর্গটি এ উপমহাদেশের জন্য এ জনগোষ্ঠীর জন্য কী করেছে? কী করতে চেয়েছে? যেমনটি আমি আগেও বলে এসেছি, 'দারুল উলূম দেওবন্দ' -এর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি। আমার অনুভূতিটাই আমি তুলে ধরছি। এ মূল্যায়ন সবার মূল্যায়নের সঙ্গে হুবহু খাপ খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, বরং দু'একজনের সঙ্গেও যদি মিলে যায় তবু গণিমত মনে করব । সে হিসাবেই বলছি-

দারুল উলূম দেওবন্দের কাজ ছিল প্রধানত দু'টি: ১. সহীহ ইলমের চর্চার মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক পরিচয়কে তুলে ধরা। ২. শক্তি অর্জনের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নেয়া। একজন মুমিন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এ দু'টি বিষয় ছিল অপরিহার্য। এমনকি দ্বীনকে তার আপন অবয়ব ও শান শওকতে টিকিয়ে রাখার জন্য দু'টির কোনটিকে কোনটির উপর প্রাধান্য দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এ দু'টি মৌলিক লক্ষ্য স্থির করে আহলে দেওবন্দ যা করেছেন এবং যা করতে চেয়েছেন তা নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে তুলে ধরছি।

কয়েকটি লক্ষ্য

গোলামীর জীবন থেকে মুক্তি:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন সে দ্বীনের অতিক্ষুদ্র ও সাময়িক একটি পর্বই মাত্র কুফরী শক্তির অধীনস্থ ছিল, তাও তা মেনে নিয়ে নয়; বরং বিদ্রোহ করে, সত্য প্রকাশ করে, দ্বীনের

উপর অটল থেকে। কিন্তু এ সূচনা পর্বের পর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরবর্তীতে তাঁর উম্মত কখনো কুফরী শক্তির অধীনস্থতা মেনে নেয়নি এবং মেনে নেয়ার বৈধতাও শরীয়তের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি।

এ সত্যের উপলব্ধি থেকেই পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিরা কখনো কুফরী বৃটিশ শক্তির কর্তৃত্ব মেনে নেননি। নিজেদের ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। ইসলামের কেন্দ্রীয় খেলাফত উসমানী খেলাফতকে সাধ্য মাফিক সহযোগিতা করেছেন। সর্বশেষ শক্তিটুকু ব্যয় করেছেন কুফরী শক্তির অধীনস্থতা থেকে মুক্তির জন্য। একটি মুসলিম ভূখণ্ডের জন্য চেষ্টা করে গেছেন। হিন্দু প্রধান দেশেও মুসলমানদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার সকল চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরা চেয়েছেন রাজত্ব আল্লাহর হোক, মানুষের নয়।

আকাবিরে দেওবন্দ মনে করতেন, মুসলমান কখনো কুফুরী শক্তির অধীনে, কুফুরী শাসনের অধীনে বেঁচে থাকতে পারে না। সূচনা পর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের মাধ্যমেই সে পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এর পুনরাবৃত্তির কোন বৈধতা নেই। তাই মদীনার পাহাড় ঘেরা ছোট্ট আয়তনের ক্ষুদ্র একটি শক্তি পৃথিবী জোড়া বৃহৎ শক্তির মোকাবেলায় লড়াই অব্যাহত রেখেছে। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে। আর সে লড়াই পরিচালিত হয়েছে এ দুর্গ থেকেই সরাসরি এবং নিয়মতান্ত্রিক সুনির্দিষ্ট ছকে এঁকে।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা:

যতদিন ইসলামের কেন্দ্রীয় খেলাফত ছিল ততদিন সে খেলাফতকে টিকিয়ে রাখার সব ধরনের চেষ্টা করে গেছেন, সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন। কুফুরী শক্তির হাতে যখন সে খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেল তখন এ ভারত উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে আল্লাহর রাজত্ব চলবে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে -এমন রাষ্ট্র গঠনের জন্য এ কাফেলা এবং এ দুর্গের মহামনীষীরাই নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভূখণ্ড, ভাষা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িকতা থেকে উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র ইসলামের পরিচয়ে একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আকাবিরে দেওবন্দ কখনো ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি, বা এর

প্রয়োজন নেই এমন মনোভাব ব্যক্ত করেননি, বা এটা আমাদের কাজ নয় এমনটি ভাবেননি।

অপরদিকে হিন্দু প্রধান দেশের মুসলমানরা যেন অধীনস্থতা গ্রহণ না করে পূর্ণাঙ্গ স্বকীয়তার সাথে দাপটের সঙ্গে দ্বীন ও শরীয়তের উপর আমল করে যেতে পারে সে প্রচেষ্টাতেও কোন প্রকার ত্রুটি করা হয়নি। পদ্ধতিগত মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং সে কাজ আমাদেরকেই করতে হবে -এ বিশ্বাস আকাবিরে দেওবন্দ সব সময়ই লালন করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করে গেছেন।

শিরক কুফর থেকে পবিত্র করা:

এ উপমহাদেশের অবস্থা এক পর্যায়ে এমন দাঁড়িয়েছে যখন ইসলাম ও মুসলমান শুধুমাত্র একটি বংশগত পরিচয় হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়া আচার আচরণ ও আকীদা বিশ্বাসে একজন মুসলমানকে একজন হিন্দু থেকে আলাদা করা দুষ্কর ছিল।

হিন্দুরা বটগাছের পূজা করে থাকলে মুসলমানরা অন্য এক গাছের পূজা করত। হিন্দুরা গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দিত আর মুসলমানরা পানির অধিপতি (?) খিজিরের জন্য ভোগ-অর্ঘ বিসর্জন দিত। পৈতা, রাখি, উল্কি, ঝুটি, চুটি ইত্যাদিতে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিথি, রাশি, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলমান সমান। পূজা পার্বনগুলো সবার জন্য সমান উপভোগ্য। প্রতিমা তৈরি, বিক্রয় ও সাজানোতে সবাই সমান সিদ্ধহস্ত। শুধু ব্যবধান এতটুকু যে, একজন মুসলমান গোষ্ঠীর আরেকজন অমুসলমান গোষ্ঠীর।

দারুল উলূম দেওবন্দের পূর্বসূরি-উত্তরসূরিগণ ইলমের এ কেন্দ্র থেকে রচনা-সংকলনের মাধ্যমে, সরাসরি দাওয়াতি কাফেলা প্রেরণ করে, ব্যাপক বয়ান ও মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। এটি যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম তা প্রমাণ করেছেন। অন্য ধর্মের সঙ্গে তার পার্থক্যগুলো কোথায় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মুসলমান দাবি করতে হলে

তাকে কি করতে হবে এবং কোন কোন কাজ ও বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

দেখুন, এ কাজগুলো ব্যক্তিগতভাবে সব যুগেই হয়েছে, একেকজন একেকটি দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কিন্তু দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীনের একটি কেল্লা হিসেবে এ সবগুলো কাজেরই যিম্মাদারী গ্রহণ করেছে। আহলে দেওবন্দ দ্বীনের সঠিক পরিচয়মূলক কিতাব পত্রের প্রচারও করেছেন এবং নিজেরা তৈরিও করেছেন। আর ইলমী তত্ত্বাবধানে তা যত সঠিকভাবে করা সম্ভব, ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে ততটুকু সম্ভব নয়। সে হিসাবে বলা যায়, দারুল উলূম দেওবন্দ ঈমান ও কুফরের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

দলিলভিত্তিক ইলম চর্চা:

বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি যার কিছুর প্রতি ইতোপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এ ধরনের আরো বহু কারণে ভারত উপমহাদেশে কুরআন-হাদীসভিত্তিক ইলম চর্চা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানের আকীদা, আমল ও লেনদেন সর্বক্ষেত্রে তার মাপকাঠি হিসেবে ছিল শুধুমাত্র ধর্মগুরু। এ ক্ষেত্রে যে যাকে পছন্দ করে বেছে নিয়েছে সেই তার মাপকাঠি। এর বাইরে কুরআনে কী আছে, হাদীসে কী আছে, ইজমা কি বলে, কেয়াসের আওতায় আসে কী না -এসকল প্রশ্ন ও ভাবনা ছিল অবান্তর। যে আকীদা আমলের উপর চলছি তার সঙ্গে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কোন সম্পর্ক আছে কি না এ নিয়ে সময় ব্যয় করা ছিল অপচয়। কেউ কখনো এমন প্রশ্ন উত্থাপন করলে সেটাই ছিল অবাক হওয়ার মত বিষয়।

'দারুল উলূম দেওবন্দ' এ ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে, **ভারত উপমহাদেশে দলিল-প্রমাণ ভিত্তিক দ্বীন চর্চার সবচাইতে বড়, ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্র হচ্ছে দারুল উলূম দেওবন্দ। এর সমকক্ষ দ্বিতীয়টি আর নেই।**

কুরআন চর্চা:

ইসলামের এ দুর্গ তার পাঠ্যসূচিতে সরাসরি কুরআন পাঠদানের ব্যবস্থা করেছে। এর পাশাপাশি কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কুরআন পড়া, তাফসীর পড়া এবং উসূলে তাফসীর তথা কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক পাঠক মুফাসসির হয়ে যাবে যদিও বিষয়টি এমন নয়, কিন্তু একজন মুসলমান এ ইলম অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চয়তা লাভ করতে পারবে যে, তার জীবন কুরআনের আলোকে চলছে। তার প্রচলিত জীবনের সঙ্গে কুরআনের যোগসূত্রতা আছে।

কুরআনের কেউ ভুল ব্যাখ্যা করলে তার কপালে ভাঁজ পড়বে। কেউ ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা করলে তার প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাবে। অনিচ্ছাকৃত কেউ ভুল করলে তা এড়িয়ে যাওয়ার সাহস পাবে। ব্যক্তির প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে এসে কুরআনকে কুরআনের মত করে বোঝার খোরাক পাবে। দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের আহবান দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হবে, আপ্লুত হবে। তাফসীর ও উসূলে তাফসীরকে পাঠ্যসূচিভুক্ত করার এ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

হাদীস চর্চা:

'দারুল উলূম দেওবন্দ' হাদীস ও উসূলে হাদীসকে তার পাঠ্যসূচিতে সন্নিবেশিত করেছে। স্বল্প পরিসরে নয়, বৃহৎ পরিসরে হাদীস চর্চার আয়োজন করেছে। পাঠ্যসূচির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে নির্বাচিত হাদীস, সনদবিহীন হাদীস, সনদসহ হাদীস। হাদীস সমগ্রের প্রসিদ্ধ প্রায় সবগুলো কিতাবই পাঠ্যসূচিভুক্ত করা হয়েছে।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামী জীবন যেন হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়। একজন মুসলমান যেন তার দৈনন্দিন আমলের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তাবোধ করতে পারে যে, তার জীবন হাদীসের আলোকে চলছে।

এক্ষেত্রে আকাবিরে দেওবন্দের একটি উদার নীতিকে কখনো ভুলে যাওয়া যায় না। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধারগণ সবাই ফিকহ ও ইস্তেমবাতের একটি বিশেষ ঘরানার সাথে যুক্ত। কিন্তু পাঠ্যসূচির জন্য

হাদীসের কিতাব নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তাঁদের ফিকহী সে বিশেষ চিন্তাধারা কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করেনি।

প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ শ্রেণীভিত্তিক বিভিন্ন স্তরে হাদীসের যে কিতাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার রচয়িতার সঙ্গে ফিকহে হানাফীর অনেক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মতপার্থক্যগুলো যেহেতু একান্তই ইজতেহাদী ও ইলমী তাই এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যে কিতাবগুলো সবচাইতে উপকারী কিতাব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে উসূলে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রকেও এ পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। একটি বক্তব্যকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বলে দাবি করতে হলে কতগুলো পর্ব অতিক্রম করতে হবে, কী কী শর্ত এক্ষেত্রে রয়েছে, সে বিষয়ক বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে।

দেখুন, হাদীস ও উসূলে হাদীসের উপর বিস্তর পড়াশোনা করে প্রত্যেক পাঠক একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস হয়ে যাবে, বা সহীহ-যয়ীফের সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্য হয়ে যাবে, হাদীস থেকে সরাসরি মাসআলা উদ্ঘাটনে সক্ষম হয়ে যাবে, হাদীসের সমগ্র ভাণ্ডার তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, হাদীসের নাসেখ-মানসূখ চিনে ফেলবে, বর্ণনাকারীদের মাঝে কে নির্ভরযোগ্য আর কে অনির্ভরযোগ্য তা বাছাই করে ফেলতে পারবে ইত্যাদি যদি নাও হয়, কিন্তু এতটুকু যোগ্যতা হবে বলে তো দাবি করাই যায় যে, একজন তালিবুল ইলম অনুধাবন করতে পারবে সে শরীয়তের বিধানগুলোকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনের মাঝে পাচ্ছে। সে আশ্বস্ত হচ্ছে যে, সে হাওয়ার উপর চলছে না। তার দৈনন্দিন প্রতিটি আমলে হাদীসের দিকনির্দেশনা পেয়ে সে আপ্লুত হচ্ছে। নববী নূরের ছোঁয়া সরাসরি পাচ্ছে।

উসূলে হাদীসের উপর মোটামুটি পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন হওয়ার কারণে উত্থাপিত দলিলগুলোর প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থান নির্ণয় করে ফেলতে পারে। একটি সহীহ হাদীসকে খোঁড়া কোন অজুহাতে কেউ অস্বীকার

করতে চাইলে মূলনীতির আলোকে সে তার প্রতিরোধ করতে পারে, আবার কেউ স্পষ্ট কোন জাল হাদীসকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তার প্রতিবাদ করার মত যোগ্যতা তার হয়ে যায়। রাসূলের উপর মিথ্যারোপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। রাসূলের হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করার গুণাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

দলিলভিত্তিক ফিকহ চর্চা:

'দারুল উলূম দেওবন্দ' দলিলভিত্তিক ফিকহ চর্চাকে তার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রথমত- ফিকহে মুদাল্লাল তথা যে সকল কিতাবের মাসআলাগুলো দলিলের উল্লেখসহ লিখা হয়েছে সে সকল কিতাবকে এ পাঠ্যসূচিতে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত- উসূলে ফিকহ তথা শরীয়তের দলীলসমূহ থেকে মাসআলা উদ্ঘাটনের মূলনীতি বিষয়ে রচিত কিতাবাদি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যসূচিতে এ দু'টি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি সুস্পষ্টভাবে জানান দেয় যে, উম্মত ব্যক্তির অনুসরণের উপর নির্ভরশীল হয়ে দলিল প্রমাণ তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াস থেকে হাত ধুয়ে বসে থাকুক তা আকাবিরে দেওবন্দ চাইতেন না। বরং তাঁরা চাইতেন ওলামায়ে কেরাম মুজতাহিদ পর্যায়ে উন্নীত না হলেও মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরাম কোন পন্থায় কিসের ভিত্তিতে মাসআলা-মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন সে পথ ও উৎসগুলোর সঙ্গে ওলামায়ে কেরামের পরিচয় থাকুক।

যদি মনে করা হয়, কোন মাসআলা কোন দলিল থেকে কীভাবে কোন মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবিত হয়েছে তা আমাদের দেখার বিষয় নয়, বা দেখা অনর্থক বা অনধিকার চর্চা তাহলে এ পুরা শিক্ষাব্যবস্থাকেই অনর্থক বলতে হবে। যে পড়াশোনার কোন প্রায়োগিক প্রভাব নেই তার পেছনে সময় ব্যয় করার কোন বৈধতা নেই।

তাই ফিকহে মুদাল্লাল এবং উসূলে ফিকহ চর্চা করার কার্যকরী দিকটি হচ্ছে, দলিল বহির্ভূত বা মূলনীতির বাইরে অন্য কোন পদ্ধতিতে যদি কেউ কোন আমলকে শরয়ী স্থান দিতে চায় তাহলে যেন নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। যে বিষয়গুলো শরীয়তের দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি তার মাধ্যমে

গায়রে শরীয়ত যাতে শরীয়তের লেবাস ধরতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা যায়। এতে করে একজন অনুসারী শতভাগ আস্থাশীল হয়ে উঠে যে, সে ফিকহ, মাযহাব ও আইম্মায়ে কেরামের ইজতেহাদের অনুসরণের মাধ্যমে মূলত দ্বীনের উৎসগুলোরই অনুসরণ করছে।

এমনিভাবে সুন্নত ও আদব শিরোনামে যে বিষয়গুলোর অনুসরণকে জরুরী মনে করা হচ্ছে দলিলের আলোকে বাস্তবেও সেগুলো শরীয়ত স্বীকৃত সুন্নত ও আদব কি না তা নিশ্চিত করা যায়।

এভাবে সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে দারুল উলূম দেওবন্দ আরো বেশ কিছু বিষয়কে তার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছে। উম্মত যেন দলিলমুখী হয়, কুরআন-হাদীসভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

তাসাওউফের পরিশুদ্ধি:

উম্মতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যে বিশেষ নিয়মকানুন অনুশীলন করেছেন তা তাসাওউফ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পদ্ধতির উৎকর্ষ ও কাজের ব্যাপ্তির সাথে সাথে এটি দ্বীনী কাজের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কর্তৃক আনীত ঈমান ও আমলের সমন্বিত রূপকে তার সঠিক পরিচয় ও সঠিক মাপকাঠিতে ধরে রাখার জন্য তাসাওউফ শিরোনামের এ মেহনতটি একটি বড় ধরনের সহযোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আত্মার ব্যাধিসমূহ নিরাময়ের জন্য কুরআন, হাদীস এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কৌশল তৈরি করেছেন, প্রয়োগ করেছেন, প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

কিন্তু মানবতার চির শত্রু দ্বীনের কোন ভালো কাজকেই ভালভাবে চলতে দিতে চায় না। আর দ্বীনের যেসব বিভাগের উপর ইলমের নেগরানী দুর্বল সেসব বিভাগে তার প্রভাব বিস্তার তুলনামূলক বেশি থাকে। তাসাওউফের ক্ষেত্রে এ বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

শরীয়তের হাকীকত উপলব্ধি ও হাদীস নির্দেশিত ইহসানের স্তরে ইবাদতকে উন্নীত করার জন্য তাসাওউফের শিরোনামে যে মেহনত চালু

করা হয়েছিল এবং এর ভালো ফলাফল উম্মত পেতে শুরু করেছিল সে তাসাওউফ কোন কোন ক্ষেত্রে এসে শরীয়তের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বসেছে। শরীয়তের যে আমলগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য তাসাওউফের মেহনত শুরু হয়েছে সে আমলগুলোকেই অনর্থক কাজ বলে আখ্যা দেয়া হল। প্রথমেই শরীয়ত ও তরীকত দু'টি নামে দ্বীনকে ভাগ করে ফেলা হল।

বলা হতে লাগল, হালাল-হারাম নির্ধারণে শরীয়ত ও তরীকতের মানদণ্ড আলাদা। কুরআন হাদীসের আলোকে হারাম ও কুফর হিসাবে প্রমাণিত বহু বিষয় তরীকতের মানদণ্ডে হালাল ও ওয়াজিব হিসাবে সামনে আসতে লাগল। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের ইলমকে বলা হল, এটা প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনদারদের ইলম। আর স্বপ্ন, কাশফ ও মুরাকাবাকে বলা হল, এটা কামেল দ্বীনদারদের ইলম। নুবুওয়াতের ইলম ও বেলায়েতের ইলম নামে দু'টি আলাদা ইলম আবিষ্কার করা হল।

আউলিয়া কেরাম আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা ও পরিচালনার উপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছেন- এমন ধ্যান ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। দ্বীনের প্রতিটি অঙ্গনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত সুন্নাহের পরিবর্তে খিযির আলাইহিস সালামের অলৌকিক পথ ও পন্থা বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালার খাস গুণাবলী বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে শুরু করেছে। সাহাবা-তাবেয়ীনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অলৌকিক-অসম্ভব ব্যাপারগুলো পরবর্তীরা ঘটাতে শুরু করেছেন। সর্বোপরি আউলিয়া কেরাম সিজদা পাওয়ার স্তরে পৌঁছে গেছেন।

কাঙ্ক্ষিত অবদানঃ

এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ দ্বীনী খেদমতের এ বিভাগটিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। ইলমী তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তাযকিয়া নফসের এ অনুশীলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। শরীয়ত-তরীকত বলতে আলাদা দু'টি অস্তিত্বের ধারণাকে বিলুপ্ত করার সাধ্য মাফিক চেষ্টা করেছেন।

তাযকিয়ায়ে নফস তথা ইহসানের মকামে উন্নীত হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীসে যেসকল নির্দেশনা এসেছে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার মাধ্যমে যেসকল ক্ষেত্রে তাসাওউফের মেহনতের বিচ্যুতি ও স্খলন ঘটেছিল সেগুলোকেও শুধরানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাসাওউফের প্রচলিত ধারাগুলোর ততটুকু মূল্যায়ন তারা বহাল রাখার চেষ্টা করেছেন যতটুকুতে শরীয়তের বিরোধিতা হয়নি। এক্ষেত্রে তাঁদের এ পদক্ষেপ ছিল সংস্কারমূলক, যে সংস্কারের তাঁরা সূচনা করেছিলেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের কর্ণধারগণের বেলায় এ দাবি করা যায় যে, তাসাওউফের পরিশুদ্ধিমূলক কার্যক্রমে তাঁরা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে সফলকাম হয়েছেন। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে যেমন রাতারাতি আপন রূপে ফিরিয়ে আনা যায় না, তেমনিভাবে আকীদা বিশ্বাসের এ চরম বিচ্যুত পরিস্থিতি থেকে একটি জাতিকে সহীহ আকীদা বিশ্বাসের উপর তুলে আনাও কোন সহজ বিষয় নয়। এর সঙ্গে যদি বহিরাগত আরো বহু বাধারও সমাহার থাকে তাহলে তা আরো কঠিন। মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দের সাহসী পদক্ষেপের বদৌলতে এ ভূখণ্ডের মুসলমানরা সহীহ আকীদা বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে এবং রূহের সহীহ খোরাক পেয়েছে।

অমুসলিমদের আগ্রাসন প্রতিরোধ:

রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল ক্ষমতা ব্যবহার করার পাশাপাশি খ্রিস্টবাদের প্রচারকরাও মুসলমানদের ঈমান আকীদার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে গির্জার অধিপতিরা অবাধে নির্দ্বিধায় নিজেদের ধর্ম প্রচারে উঠেপড়ে নেমে গিয়েছিল। সরলমনা মুসলমানদেরকে মিথ্যা গল্প শুনিয়ে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিষ ছড়িয়ে বিভ্রান্ত করার সব ধরনের কৌশল তারা ব্যবহার করে চলছিল।

এমন এক নাযুক পরিস্থিতিতে ওলামায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ ইসলামের শোভা- সৌন্দর্যকে তুলে ধরে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের মিথ্যা গল্পের অসারতা প্রমাণ করে, ইসলামের সঠিক অবয়ব ও পরিচয়কে সামনে এনে এ মুসলিম জাতিকে সঠিক ধর্মের উপর টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। পাদ্রীদের সঙ্গে সম্মুখ বিতর্ক

করেছেন, আর ইসলামের দাওয়াতকে সকল অঙ্গনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ইসলামের পথে দাওয়াত দানকারীরা সবাই আজো তাঁদের সেসকল দাওয়াতি কলা কৌশল দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, তাদের এ বিষয়ক গ্রন্থাবলী আজো অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দ আরো অসংখ্য স্বপ্ন ও কর্ম নিয়ে পথ চলা শুরু করেছে, শতাব্দীকাল চলেছে, এখনো চলছে। গন্তব্য সুনিশ্চিত, গতি পরিমিত এবং পদক্ষেপ দৃঢ়।

সাত.

মূল্যায়ন-অবমূল্যায়ন

এক পর্যায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের কার্যক্রম ও অবদানকে নিক্তিতে মাপার সময় এসেছে। এর অর্জন-বিসর্জন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যায়ন-অবমূল্যায়নের পর্বগুলোও অনেক ধাপ অতিক্রম করে ফেলেছে। এসবের বিশ্লেষণ দীর্ঘসূত্রে গাঁথা। এ উপাখ্যানের শুরু আছে শেষ নেই।

তবে প্রাথমিক ধারণা নেয়ার জন্য বলা যায়, দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা দরূদ-সালাত পড়তে গিয়ে বসা থেকে না দাঁড়ানোর কারণে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের তৈরি না বলে মাটির তৈরি আদমের সন্তানদের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তৈরি বলার কারণে 'কাফের' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আবার أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله এর أشهد উল্লেখ না করে لا إله إلا الله محمد رسول الله বলার কারণে 'মুশরিক' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছেন।

দ্বিমুখী মূল্যায়ন-অবমূল্যায়নের প্রতিচ্ছবি যখন এমন তখন এর দাস্তান নিশ্চয় সংক্ষিপ্ত নয়। সবার সকল অভিযোগ ও মনোবেদনার ফিরিস্তি দীর্ঘ

তো বটেই, উপরন্তু আকাশ পাতাল ব্যবধানপূর্ণও। তাই এর সমাধান বা এর জবাবের পেছনে মেধা ব্যয় করা অনর্থক।

তবে দারুল উলূম দেওবন্দ যে লক্ষ্য স্থির করে পথচলা শুরু করেছে সে গন্তব্য আর কতদূর? যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছিল তার কতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে? দারুল উলূম দেওবন্দের প্রজন্মের পর প্রজন্মগুলো তার আবেগ-অনুভূতি কতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছে? এবং বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি হিসাবে তারা কোন দিকে চলছে- এর একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ হতে পারে। সে জরিপের ফলাফল সবার জরিপের সঙ্গে মিলে যাবে এমনটি আশা করা ঠিক নয়, তবে কারো সঙ্গে মিলে গেলেও ভাগ্য।

মোটকথা দারুল উলূম দেওবন্দের মিত্রদের বহু আশা-আকাঙক্ষা, আর শত্রুদের আপত্তি-অভিযোগ দু'টির সংমিশ্রণে দারুল উলূমকে ঘিরে কিছু পর্যালোচনা, আলোচনা ও সমালোচনা গড়ে উঠেছে। যার কিছুকে মিত্রদের অতৃপ্তি, আর কিছুকে শত্রুর অবমূল্যায়ন, আবার কিছুকে لکل جواد کبوۃ ولکل صارم نبوۃ (দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ধারালো তরবারী কখনো ভোঁতা হয়ে যায়) -এসব প্রকারে ভাগ করা যায়।

এক্ষেত্রে মোটামুটি যে বিষয়গুলো আলোচনা-সমালোচনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে সেগুলো হচ্ছে: ১. ইলম চর্চার সঠিক মাপকাঠি থেকে বিচ্যুতি। ২. বিদআতের বেড়াজাল থেকে অমুক্তি। ৩. জিহাদী চেতনার বিস্মৃতি। ৪. স্বাধীন চেতনার বিলুপ্তি। ৫. পরনির্ভরতার প্রতি আসক্তি।

এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির আলাদা বিশ্লেষণের আগে সংক্ষেপে যে কথাটি বলা যায় তা হচ্ছে, এ দাবিগুলোর বাস্তবতা ততটুকু নয় যতটুকু দাবি করা হচ্ছে। এরপর যে বাস্তবতাগুলো আছে সেগুলোর অনেকগুলোই এমন যার দায় দায়িত্ব ব্যক্তি বিশেষের উপর বর্তায়, একটি কাফেলা যার যিম্মাদারী নিতে বাধ্য নয়। সর্বোপরি এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা দারুল উলূম দেওবন্দের চলমান প্রক্রিয়ার অধীনে বিলুপ্ত হওয়ার পথে বা বিলুপ্ত হওয়ার জন্য মূলনীতি দেয়া হয়ে গেছে। কিন্তু প্রজন্ম বা প্রজন্মের কিছু অংশ যে চলমান প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিয়েছে সে দায়িত্ব অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অংশকেই নিতে হবে।

দেখুন, একটি মাকতাবায়ে ফিক্‌র সভ্যতা কেন্দ্রের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন চিন্তা-চেতনা বা কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কখনো মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের উপর বর্তায় না।

এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের পর কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

আট.

অভিযোগসমূহ ও তার জবাব

অভিযোগ- ১ ঃ ইলম চর্চার সঠিক মাপকাঠি থেকে বিচ্যুতি

আপত্তি তোলা হয়েছে, দেওবন্দীরা কুরআন-হাদীস ছেড়ে আকাবিরের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জবাবঃ

আপত্তিটি সঠিক নয়। এ ভারত উপমহাদেশে দলিলভিত্তিক ইলম চর্চার ধারা দেওবন্দের ওলামায়ে কেরামই চালু করেছেন। আকাবিরের অনুসরণের জন্য তাঁদের মালফুযাত ও মাজালিস অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট ছিল।

কুরআন, তাফসীর ও হাদীস কেন্দ্রিক এত বিশাল পাঠ্যসূচির প্রয়োজন ছিল না। উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহ নিয়ে গবেষণা করার এ দীর্ঘ আয়োজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেকটি মাসআলা দলিলসহ পড়ার প্রয়োজন ছিল না। কোন মাসআলা নিয়ে অন্য কারো দ্বিমত থাকলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ ওলামায়ে দেওবন্দ এ কাজগুলো করেছেন, করে চলেছেন এবং চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে বলা যায় তা চলতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আজো পর্যন্ত দারুল উলূম দেওবন্দের ধারায় পরিচালিত মাদরাসাগুলোর অধীনে যেসকল দারুল ইফতা রয়েছে সেসবের দায়িত্বশীলগণ কখনো মনে করেন না যে, কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসকে বাদ দিয়ে, ফিকহের সকল কিতাবকে উপেক্ষা করে আকাবিরে দেওবন্দের কারো উদ্ধৃতি দিয়ে

কোন ফাতওয়া চালিয়ে দেবেন। দলিলের বিপরীতে আকাবিরের কথা বা কাজকে প্রাধান্য দেবেন, সে ভিত্তিতে ফাতওয়া দেবেন -এতটা অধঃপতিত অবস্থার শিকার আমরা আশা করি হইনি।

দারুল ইফতাগুলো থেকে যেসব ফাতওয়া প্রকাশ পায় সেগুলোতে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, প্রায় প্রত্যেকটি ফাতওয়ায় কুরআনের আয়াত, হাদীস, ফিকহ ও ফাতওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি রয়েছে। উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইফতার আলোকে একেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। এরপরও যদি বলা হয়, দলিলের অনুসরণ করা হচ্ছে না তা হলে আর কি বলার আছে?

আত্মকথা:

তবে যে কথাটি স্বীকার করে নিতে কোন প্রকার দ্বিধা থাকা উচিত নয় তা হচ্ছে, দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন কোন ব্যক্তি থেকে কোন কোন সময়ে এমন কিছু আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে শত্রুপক্ষ এমন আপত্তি তুলতে পারে। আবার এসব ক্ষেত্রে একথাও স্বীকৃত যে, এর দায়দায়িত্ব আকাবিরে দেওবন্দের উপর বর্তায় না। এজন্য আমরাই দায়ী।

যেমনটি আমরা আগেও বলে এসেছি, একটি মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিচ্যুত ও স্খলিত কোন চিন্তা-চেতনা বা কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কখনো মাকতাবায়ে ফিকর-সভ্যতা কেন্দ্রের উপর বর্তায় না।

দুয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলে হয়ত বিষয়টি বোঝতে সহজ হবে।

ক. তাহাজ্জুদের জামাত:

দেওবন্দের এক গর্বের ধন, যিনি মুসলমান, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্যই জীবনটাকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন শায়খুল আরব ওয়াল আজম সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর একটি বিশেষ আমল ছিল, তাহাজ্জুদের নামায জামাতে পড়া।

হাদীস, আসারে সাহাবা ও মুজতাহিদীনে কেরামের দীর্ঘ তাহকীকের পর শেষ ফয়সালা এটাই হয়েছে যে, এভাবে তাহাজ্জুদের নামায মাকরূহ। হানাফী মাযহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এটাই। ওলামায়ে দেওবন্দের সকল আকাবিরের আমলও এ মতের উপরই।

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ কেন আমলটি করতেন তা যদি আমরা জানতে নাও পারি তবু বলতে পারি, তিনি দীর্ঘকাল মদীনায় জীবন কাটিয়েছেন। সেখানকার একদল ওলামায়ে কেরাম তাহাজ্জুদের জামাতের প্রবক্তা, অনেকে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহকে এক করেও তাহাজ্জুদের জামাতের পক্ষ নিয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন দলিলের আলোকে হানাফী মাযহাবের শেষ সিদ্ধান্ত এটাই যে, তাহাজ্জুদের জামাত মাকরূহ।

এমতাবস্থায় কী করণীয়? দেখা গেছে আমরা যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী, বিশ রাকাত তারাবীহের প্রবক্তা, তাহাজ্জুদ ও তারাবীহের নামাযকে আলাদা করার পক্ষে এবং যে বিষয়ে হানাফী ওলামায়ে কেরাম ও আহলে দেওবন্দ সবাই একমত এমন একটি বিষয়েও আমাদের একটি জামাত মাদানী রাহিমাহুল্লাহ আমল করেছেন শুধুমাত্র একারণে তাহাজ্জুদের জামাতকে একটি নিয়মিত আমলে পরিণত করেছে। বিভিন্ন রকমের ইলমী সমস্যা সৃষ্টি করে হলেও একে একটি মাসনূন আমল হিসাবে প্রমাণ করার অযথা চেষ্টা করছে। বলা যায়, تفردات الشيخ ليست بحجة (বড় ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা দলিল নয়) এমন একটি স্বীকৃত মূলনীতিকে উপেক্ষা করে আমরা এ আমলটি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি।

এখন আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাজ্জুদের জামাতের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উপর এ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে, ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণের প্রবণতা আমাদের মাঝে এতটাই বেশি যে, আমরা ব্যক্তির অনুসরণের জন্য নিজেদের আভ্যন্তরীণ সর্বসম্মত বিষয়েও মতভেদ সৃষ্টি করতে দ্বিধাবোধ করিনি। তাহলে বহিরাগত বিষয়েও ব্যক্তির প্রভাব আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে বের হতে দিবে না এটাই স্বাভাবিক।

অথচ হাদীস ও আসারে সাহাবার দাবি অনুযায়ী, ফিকহে হানাফীর সিদ্ধান্তের দাবি অনুযায়ী এবং সর্বশেষ আহলে দেওবন্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবি এটাই যে, শায়খ রাহিমাহুল্লাহর এ আমলের কোন প্রকারের সমালোচনা না করে আমরা এ আমল থেকে বিরত থাকতে পারতাম। এতে শায়খ রাহিমহুল্লাহর সঙ্গে কোন প্রকার বেয়াদবির তো প্রশ্নই আসে না, উপরন্তু আমাদের ভিতরগত আরেকটি অপ্রয়োজনীয় ইখতেলাফের বীজ বপন করা থেকে বেঁচে যেতাম।

খ. নূরের তৈরিঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের আরেক মহান ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সুপরিচিত 'নশরুত তীব' কিতাবের শুরুতে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টি সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ঘটনাক্রমে সে হাদীসটি ছিল জাল-মাউযূ। আর হাদীসটি এমন জাল যার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কারো কোন দ্বিমত নেই এবং দ্বিমত করার কোন সুযোগও নেই। হাদীসের মুসনাদ যে কিতাবের উদ্ধৃতি তিনি উল্লেখ করেছেন সে কিতাবে হাদীসটি নেই। এরপর হাদীসটি ইসলামের এমন অনেক স্বীকৃত বিশ্বাসের পরিপন্থী বক্তব্যে ভরা যার উপস্থিতিতে এটি কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হতে পারে না।

আর সবচাইতে বড় কথা হল, কোন একটি বক্তব্যকে রাসূলের হাদীস বলে দাবি করতে হলে অবশ্যই তার বর্ণনাসূত্র লাগবে এবং সে বর্ণনাসূত্র জালিয়াতিমুক্ত হতে হবে। শুধু আবেগের তাড়নায় কোন বক্তব্যকে হাদীসে রাসূল বলে দাবি করা যাবে না।

এক্ষেত্রে আমরা যারা হাকীমুল উম্মত রাহিমাহুল্লাহর হাজার হাজার রচনাবলীর দ্বারা প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছি, আমরা যদি ধরে নিতাম যে, তাঁর এত দীর্ঘ ইলমী জীবনে এমন দুয়েকটি ভুল হতে পারে, অথবা ধরে নিতাম তিনি যে কিতাব থেকে ইস্তেফাদা করেছেন সে কিতাবে হাদীসটি ছিল বলে নিয়েছেন, অতিরিক্ত তাহকীক করার সুযোগ হয়নি, অথবা তিনি

তাহকীক করেছেন কিন্তু সে তাহকীক আমাদের সামনে আসেনি- এমন অনেক কিছুই হতে পারে যার কোনটিই অসম্ভব নয়।

কিন্তু দেখা গেছে, দলিলভিত্তিক তাহকীক করে যখন এ জাল হাদীসটিকে জাল বলে প্রকাশ করা হল তখন ঘরের লোকেরাই এ মুহাককিককে -যিনি ইলমের সঠিক মাপকাঠিতে বিচার করে বহু মেহনতের পর এ হাদীসের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে দিয়েছেন, উম্মতকে من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (যে কেউ ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা প্রস্তুত করে নেয়) -এর কঠিন ধমকি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন, বিদআত পন্থীদের বাতিল আকীদা প্রতিষ্ঠা করার শক্তিকে অসার বলে প্রমাণ করেছেন -তাঁকে গায়রে মুকাল্লিদ, আহলে হাদীস, নতুন মুহাককিক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছেন, বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।

অসহায়ত্ব:

এমন ব্যক্তিবর্গ এর বিরোধিতা করেছেন যারা একটু চেষ্টা করলেই এ তাহকীক ও বিশ্লেষণের সঠিকতা বুঝতে পারতেন। এ হাদীসের তাহকীকের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে নিয়োজিত করে এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারতেন। হাতের কাছে যে কিতাবগুলো ছিল সেগুলো উল্টালেই সঠিক বিষয়টি খুঁজে পেতেন।

কিন্তু ইলমের সাধারণ দাবি অনুযায়ী, সর্বনিম্ন আদব রক্ষা করে যা যা করা যেত তা না করে মন্তব্য করলেন, হাকীমুল উম্মতের লেখার উপর কলম ধরার অধিকার তাকে কে দিয়েছে? এ সাহস সে কোথায় পেল? হাকীমুল উম্মত রহ. বেশি বোঝেন না সে বেশি বোঝে- ইত্যাদি বাক্যাবলী যার সঙ্গে ইলমী তাহকীকের কোন সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে আমার উস্তাযে মুহতারাম রহ., আমি এখন তাঁর নাম নেব না, তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন -আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমাকে এক, দুই, তিন মজলিসে একই কথা বলতে থেকেছেন, যুবায়ের! হাদীসটি সম্পর্কে তোমরা আরও একটু ভাল করে দেখ। থানভী

রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটি এনেছেন। উস্তাযে মুহতারামকে আমি সর্বশেষ বলেছিলাম, আমাদের সাধ্যে যা ছিল তা তো আমরা দেখেছি, এখন আপনার কাছে এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার পক্ষে যদি কোন তথ্য থেকে থাকে তাহলে তা আমাদেরকে দিন, আমরা তা থেকে ইস্তেফাদা করব। এরপরও তিনি আমাকে বলেছেন, তোমরা আবার একটু দেখ। তখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে।

সংশয়ঃ

এখন একটি ইলমী বিষয়ে আমাদের এই যে আচরণ তা দেখে শত্রুপক্ষ যদি অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, দলিলের বিপরীতে ব্যক্তির প্রভাবে আমরা এতটাই প্রভাবিত যে, দলিলকে গ্রহণ করতে আমাদের মন কোনভাবেই প্রস্তুত নয়, তাহলে শত্রুর এ অভিযোগ আমরা খণ্ডাবো কীভাবে।

আবার এটাও সত্য যে, এর জন্য আকাবিরে দেওবন্দ দায়ী নন, তাঁরা আমাদেরকে এভাবে শেখাননি। কিন্তু আমার ভুল চিন্তা ও মানসিকতার কারণে শত্রুর সামনে পুরা আহলে দেওবন্দের বদনাম হল। এর জবাব আমাকেই দিতে হবে। ভুল পদ্ধতিতে আকাবিরে দেওবন্দের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে দ্বীনী ও ইলমীভাবে তাঁদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিলাম। এটা আমরা ঠিক করিনি।

এ প্রসঙ্গেই আমি একটি প্রশ্ন করি। বিদআতী আকীদা যারা পোষণ করে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের তৈরি বলে থাকে। এরই বিপরীতে ওলামায়ে দেওবন্দ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি আদম সন্তান হিসাবে মানুষ যে উপাদানে তৈরি সে উপাদানেই তৈরি।

বিদআতী আকীদাপন্থীরা তাদের দাবির পক্ষে أول ما خلق الله نوري (আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন) এ জাল হাদীসটিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে থাকে। এর সঙ্গে তারা আরেক মাত্রা যোগ করে থাকে যে, হাদীসটি দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের অগ্রপথিক হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবীর কিতাবে আছে।

এ ক্ষেত্রে এসে আমার প্রশ্ন হল, এর জবাবে আমরা কী বলব? আমরা কি এ হাদীসের আলোকে শেষ পর্যন্ত এ কথাই মেনে নেব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি ছিলেন? নাকি বলব, হাদীসটি জাল। জাল হাদীস দিয়ে দলিল দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে ইলমের মূলনীতির সিদ্ধান্ত কী? ওলামায়ে দেওবন্দের মূলনীতির আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কী হওয়া উচিত? উল্লেখ্য, হাকীমুল উম্মত রহ. তাঁর কিতাবে এ হাদীসটির একটি জবাব দিয়েছেন। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে একটি জাল হাদীসের ব্যাখ্যা করার কষ্ট আমার মাথায় নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয়ত, যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যের একেবারেই বিপরীত।

গ. বিশেষ যিক্‌র:

দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি কাফেলার মাঝে শুধু إلا الله শব্দে যিকিরের ব্যাপক প্রচলন আছে। এ যিকিরের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে শুধু إلا الله বলে যিকির করা জায়েয আছে কি না। প্রশ্নকারীরা এভাবে প্রশ্ন করেছেন যে, إلا الله অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ ছাড়া"। তাহলে لا إله এর উল্লেখ না করে যদি إلا الله বলা হয় তাহলে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয়।

মুহাককিক ওলামায়ে কেরাম এ যিক্‌রের ব্যবহার এবং পদ্ধতির উপর গবেষণা করে, কিতাবপত্র ঘাটাঘাটি করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, প্রথমত إلا الله শব্দের অর্থ "আল্লাহ ছাড়া" নয়, বরং এর অর্থ হচ্ছে, "শুধুই আল্লাহ"। দ্বিতীয়ত যারা إلا الله এর যিক্‌র করেন তাঁরা এর আগে لا إله অংশের ভাবার্থকে মাথায় রেখেই إلا الله যিক্‌র করেন। অতএব এর মাঝে নাজায়েযের কিছু নেই, আর শিরক কুফরের তো প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু মুহাককিক ওলামায়ে কেরাম এ তাহকীক পেশ করার সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, শুধু إلا الله উচ্চারণ করে এ পদ্ধতির যিকর নববী যুগ ও সাহাবা যুগে ছিল না। তাছাড়া শব্দ হিসাবে এর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া' হতেও পারে। তাই এ পদ্ধতির যিক্র অনুত্তম এবং পরিহার করলে ভালো। কুরআন হাদীসে যে পদ্ধতির যিকর বর্ণিত হয়েছে সে পদ্ধতির যিকরই সবচাইতে উত্তম এবং বেশি সাওয়াব পাওয়ার উপায়।

অসহায়ত্বঃ
দুঃখের বিষয়, দেওবন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি পক্ষ মুহাককিকগণের এ সুন্দর ইলমী বিশ্লেষণকে ভালোভাবে নেননি। উপরন্তু ব্যঙ্গাত্মক উপাধিতে ভূষিত করে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য, এর কারণে এ তাহকীকের উপর আমল করা সম্ভব হয়নি। শত্রুপক্ষের আপত্তির সুযোগ বেড়েছে। অথচ এর জন্য না দেওবন্দের মনীষীরা দায়ী, আর না দেওবন্দের মানহাজ দায়ী। দায়ী হলাম আমরা কিছু অযোগ্য অনুসারী। শত্রুর বলার সুযোগ হয়েছে, আমরা কুরআন হাদীসের উপর ব্যক্তি বিশেষের আমলকে প্রাধান্য দেই।

ঘ. ফাযায়েলে আমালঃ
শায়খ ইলিয়াস কান্ধলভী রহিমাহুল্লাহর বাতলানো তারতীব অনুযায়ী পরিচালিত দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ বিশ্বব্যাপী চলছে, কোটি কোটি মানুষ আজ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আলহামদুল্লিাহ। একে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি অন্যতম পদ্ধতি একে বলা যায়।

দাওয়াতের কাজের সুবিধার্থে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রাহিমাহুল্লাহ 'ফাযায়েলে আমাল' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। আয়াত, হাদীস ও আসারের আলোকে কিতাবটি রচনা করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এর তালীম হয়ে আসছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন ইলমী গবেষণাগার থেকে এ আওয়াজ উঠেছে যে, 'ফাযায়েলে আমাল' কিতাবে এমন কিছু হাদীসের উল্লেখ এসেছে উসূলে হাদীসের বিচারে যেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে উল্লেখ করা বা বয়ান করা উচিত নয়। সেসব বক্তব্য ও বর্ণনাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে ইলমী আমানতের দাবি হচ্ছে, আপত্তি উঠেছে -এমন ক্ষেত্রগুলোকে দলিলের আলোকে পর্যালোচনার টেবিলে নিয়ে আসা, আপত্তির যতটুকু বাস্তবসম্মত নয় তা পরিস্কার করে দেয়া, আর যতটুকু বাস্তবসম্মত ততটুকু অস্বীকার না করা এবং এক্ষেত্রে ইলমকেই বিচারক হিসেবে মেনে নেয়া। এতে কখনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির অবদানকে খাটো করা হয় না।

অসহায়ত্ব:

কিন্তু আবনায়ে দেওবন্দেরই কিছু কিছু আচরণ থেকে শত্রুপক্ষ একথা বলার সুযোগ পাচ্ছে যে, দেওবন্দ বা তাবলীগের লোকেরা এ কিতাবকে কুরআনের মত মনে করে, এর সামান্যতম কোন ভুল ধরাকে তারা বৈধ মনে করে না। কোন বক্তব্য বা বর্ণনা কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের বিপরীত হলেও তা মেনে নেয়াকে তারা জরুরী মনে করে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে এ বদনামগুলো আমাদের কাঁধে নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দাওয়াতের হাজারো পদ্ধতির মধ্যে শুধুমাত্র বিশেষ একটি পদ্ধতিকে একমাত্র আল্লাহর রাস্তা বলে সাব্যস্ত করা। অন্যসব দাওয়াতের পদ্ধতিকে পদ্ধতি হিসেবে অস্বীকার করা এবং দাওয়াত ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য বিভাগগুলোকে হেয় করা বা অস্বীকার করা বা অকার্যকর মনে করা -এসবই আসলে ভুল বক্তব্য এবং ভুল ধারণা। এ ভুলগুলো এক সময় সাধারণ নিরক্ষর মানুষদের থেকে প্রকাশ পেত। এখন কেন্দ্র থেকে, কেন্দ্রীয় লোকদের থেকে, লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে এবং দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ওলামায়ে কেরাম থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

আসলে দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজ ও তার ইলমের মাপকাঠি কি এগুলোকে সমর্থন করে? এখন শত্রুপক্ষ যদি দাবি করে, এর মাধ্যমে পুরা দ্বীনকে একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, দ্বীনের সামগ্রিকতাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, তাহলে এজন্য না শত্রুপক্ষকে দায়ী

করা যাবে, আর না দারুল উলুম দেওবন্দের কর্ণধারগণকে দায়ী করা যাবে, আর না শায়খ ইলয়াস রাহিমাহুল্লাহকে দায়ী করা যাবে। এর জন্য মূলত দায়ী আমরা, আমাদের কর্মপন্থার ভুল পরিচালনা।

ঙ. গোমরাহ ও কাফের:

আকাবিরে দেওবন্দ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেবের চিন্তা-চেতনাকে ভুল বলে আখ্যা দিয়েছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে তাকে গোমরাহ বলেছেন। ইসলামের যে তাসাওউর-প্রতিচ্ছবি মওদূদী সাহেব এঁকেছেন তা কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণে তাঁকে এবং তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীকে উলামায়ে দেওবন্দ ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত দল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। দলীলের আলোকে একটি দল বা মতবাদকে যে পর্যায়ে রাখা উচিত সে পর্যায়ে তাদেরকে রেখেছেন। ইলমের আমানতের দাবী হিসাবেই তাদেরকে কাফির বা মুনাফিক বলেননি। ব্যক্তিগত আবেগ ও ক্ষোভকে স্থান দেননি।

ধোঁয়া থেকে আগুনে ঝাঁপ:

কিন্তু আবনায়ে দেওবন্দের মাঝেই এমন অতিউৎসাহীর আবির্ভাব ঘটেছে যিনি এ গোমরাহ মওদূদী ও মওদূদীবাদের বিরোধিতা করার জন্য এমন একটি পক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন যারা নিজেদেরকে হিন্দুও মনে করে না মুসলমানও মনে করে না। যাদের কাছে মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা সমান সম্মান পাওয়ার অধিকারী। যাদের কাছে অন্য ধর্মের বিপরীতে ইসলাম ধর্মের কোন প্রাধান্য নেই। যারা সংবিধান থেকে ইসলাম ধর্মের ছায়া পর্যন্ত মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর। যারা হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে শহীদ খেতাবে ভূষিত করে। যারা ভাস্কর্য ও মূর্তির পদতলে পুরা জাতিকে নতশির করার নকশা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। যারা বলেছে ঢাকা শহরের মসজিদগুলোকে শৌচাগারে রূপান্তর করা উচিত। নাউযুবিল্লাহ।

যে বদমাশগুলো প্রকাশ্য লোকালয়ে যিনা ব্যাভিচারের আয়োজন করেছে, সে উলঙ্গ নারীদের বেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দেয়াকে জরুরী মনে করেছে যে, মওদূদীবাদ ইসলামের দুশমন। দেশপ্রেমের আবেগে কাবু হয়ে

তার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় এ কথাটিকেও স্থান দেয়া জরুরী মনে করেছে যে, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ. ও ইসমাইল শহীদ রহ. বালাকোটের ময়দানে যে যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন তারই চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়েছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, যে যুদ্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই শহীদ (!?) হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সকল দলিলকে উপেক্ষা করে শুধু ব্যক্তির প্রভাবে এক দল সে দিকে ছুটে চলেছে। যার ফলে ব্যক্তির সামনে দলিল ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

সংশয়ঃ

এখন শত্রু পক্ষের কেউ যদি প্রশ্ন করে, আকাবিরে দেওবন্দ যে মওদূদীকে গোমরাহ বলেছেন সেটা সঠিক? নাকি এ অতিউৎসাহী যে নাস্তিকদের সহযোগিতা নিয়ে মওদূদীর বিরোধিতা করতে হবে মনে করছে -এটা সঠিক? বলাবাহুল্য, এর জবাবে আমরা এমন কিছু বলতে পারি না যা সত্যকে ঢেকে দেয়। এমন কিছু বলতে পারি না যা আকাবিরে দেওবন্দের দলিলভিত্তিক সিদ্ধান্তকে উল্টে দেয়। কারো ব্যক্তিগত ক্ষোভকে প্রশ্রয় দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে যোগান দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমের মাপকাঠিকে ভূলুণ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

চ. দলিল কী?

ওলামায়ে দেওবন্দের পরিচয় বহনকারী একাধিক মাকতাবায়ে ফিকরের কিছু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষ থেকে এ আওয়াজ শোনা গেছে যে, উম্মত দলিলের পেছনে পড়ে গোমরাহ হয়ে গেছে।

আল্লাহ হেফাযত করুন। এ কথা কোন মুসলমানের হতে পারে না। কোন আলেমের কথা হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আর ওলামায়ে দেওবন্দের সঙ্গে যারা এ বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করবে তারা যিন্দিক। ওলামায়ে দেওবন্দ এ কুফরী কথা থেকে শতভাগ পবিত্র। براءة الذئب من دم ابن يعقوب (ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের রক্ত থেকে নেকড়ে যেভাবে পবিত্র)। এ উম্মতের দলিল অর্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। যদি কেউ মনে করে কুরআন-হাদীসের পেছনে পড়ে উম্মত গোমরাহ হয়ে গেছে তা হলে সে মুরতাদ। এ কুফরী উক্তির কোন ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ উক্তি দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, মাদরাসা শিক্ষায় পড়ুয়ারা হেদায়া জামাত পড়ার আগ পর্যন্ত হেদায়াতের উপর থাকে, হেদায়া জামাত থেকে যত উপরে যায় তত সে গোমরাহ হতে থাকে। কারণ হেদায়া জামাতের আগ পর্যন্ত সাধারণত দলিলমুক্ত দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়, আর হেদায়া জামাতের পর থেকে দলিলভিত্তিক দ্বীন শিক্ষা দেয়া হয়।

এখন কোন অপদার্থ যদি এ কুফরী কথা ও বিশ্বাসের জন্য ওলামায়ে দেওবন্দকে দায়ী করে যাঁরা দলিলভিত্তিক শরয়ী জীবনের জন্য দলিলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন, এমনিভাবে সেসব ওলামায়ে কেরামকে দায়ী করে যাঁরা দলিলভিত্তিক শরয়ী জীবনের জন্য রাত-দিন দলিলভিত্তিক পাঠদান করে যাচ্ছেন তা হলে এ অপদার্থের জন্য উপযুক্ত জবাব কী হতে পারে? অথবা যে বিচ্যুত দলটি এমন কুফরী কথা বলছে তার কী শাস্তি হতে পারে সেটা ভাবা দরকার।

এ ধরনের বিক্ষিপ্ত বহু উদাহরণ রয়েছে, যেগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রজন্মের কেউ কেউ ইলমের সঠিক মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। যার ফলে শত্রুর আক্রমণ খুব সহজ হয়ে গেছে। অথচ এর জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ, তার মানহাজ ও তার কর্ণধারগণ দায়ী নন। এ অবস্থা থেকে উঠে আসার জন্য যেমনিভাবে দেওবন্দের সঠিক চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরতে হবে, তেমনিভাবে অনস্বীকার্য বিচ্যুতি থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সমস্যার সমাধান তালাশ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না।

অভিযোগ- ২ঃ বিদআতের বেড়াজাল থেকে অমুক্তি

অভিযোগ উঠেছে, দারুল উলূম দেওবন্দ, আহলে দেওবন্দ ও দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা বিদআতের জালে আবদ্ধ। তারা বিদআতকে প্রশ্রয় দেয় এবং বিদআতের লালন করে।

জবাবঃ

এ আপত্তিটি সঠিক নয়। দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দ বিদআতী আকীদা বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নেয়ার কারণে তাদেরকে

ওহাবী ও কাফের বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি আদমের সন্তান, মানুষের মত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তিনি গায়েব জানতেন না, তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন, তিনি মহামানব তবে অতিমানব নন, দূরের সালাত ও দরূদ তিনি সরাসরি শুনতে পান না। মাজারে সিজদা করা শিরক, কবরওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া শিরক ইত্যাদি আকীদা পোষণ করার কারণে এবং প্রচার করার কারণে তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। অথচ এ আকীদাগুলো হুবহু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এ হল আকীদার বিষয়।

অপর দিকে দরূদ পড়ার সময় বিশেষ মুহূর্তে বসা থেকে না দাঁড়ানোর কারণে, আযানের আগে সম্বোধনসূচক সালাত ও সালাম না বলার কারণে, আযান ও একামতে মুহাম্মাদ নাম শুনে আঙ্গুলে চুম্বন না করার কারণে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য নবজাতকের মত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলার কারণে আহলে দেওবন্দকে গোস্তাখে রাসূল বলা হয়েছে। অথচ দলিলের আলোকে বিষয়গুলো এভাবেই প্রমাণিত।

এভাবে আকীদা ও আমলের প্রতিটি অঙ্গন বিদআতের যে বহুস্তর ময়লায় ঢেকে ছিল সে ময়লা দূর করতে গিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দ বহু বদনাম কুড়িয়েছেন। কুরআন-হাদীস তথা দলিলবিহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত একটি মুমূর্ষু মৃত প্রায় জাতিকে তার অধঃপতনের গহ্বর থেকে তুলে আনতে, ওষ্ঠাগত প্রাণকে আবার দলিলের পানিতে ভিজিয়ে সজীব করে তুলতে ওলামায়ে দেওবন্দকে বহু কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে।

এসব প্রসঙ্গে কেবলই মনে পড়ে যায় জার্মানীর সে নব মুসলিম মুহাম্মদ আসাদের আরবের মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। প্রখর রোদের তাপে আর মরুভূমির বালুর উত্তাপে যিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকু যখন মিলিয়ে যাচ্ছিল তখন উদ্ধার কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আলতো করে ভেজা কাপড় দিয়ে চেহারা মুছে দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে, বিন্দু বিন্দু পানি দিয়ে যে তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল, সে দৃশ্যপট

ভেসে ওঠে যখন বিদআতমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দের মেহনতগুলোকে আমরা দেখি।

কাঙ্ক্ষিত অবদানঃ

বিদআতের বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের মূল্যায়ন করতে হলে অবশ্যই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময়ে ভারত উপ-মহাদেশের অবস্থা এবং বিদআতের সয়লাব কত মাত্রায় ছিল তা মাথায় রাখতে হবে।

আমরা বর্তমানে বিদআত বলতে যে কিছু আমল ও কিছু আকীদার ভিন্নতাকে মনে করি তা নয়, বরং হিন্দুস্তানে বিদআতের প্রকৃতি ছিল, মানুষ শুধু এতটুকু জানত যে তারা জাতি হিসাবে মুসলমান, কিন্তু বাহ্যিক অবয়বে, ঈমানে আমলে হিন্দু বা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সঙ্গে তাদের কোন ব্যবধান ছিল না। বর্তমান দেওয়ানবাগী, আটরশি, চন্দ্রপাড়া ও ভাণ্ডারীদের চাইতেও আরো শোচনীয় অবস্থা ছিল। ওলামায়ে দেওবন্দ সেখান থেকে তাদেরকে তুলে আনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করেছেন।

তাসাওউফের নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যে সকল বিদআত শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ওলামায়ে দেওবন্দ ইলমের সঠিক চর্চার মাধ্যমে কিতাব-পত্র রচনা করে সেগুলোর অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। বাতেনী ইলমের দাবি করে যিন্দীক ও মুলহিদ সম্প্রদায় কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত আকীদা ও আমলের অপব্যাখ্যা দেয়ার যে অপচেষ্টা চালিয়ে আসছিল, আকাবিরে দেওবন্দ কুরআনের সঠিক তাফসীর ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

ইলমের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত এবং কুরআন ও হাদীসের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী সম্প্রদায় যখন শরীয়তের প্রতিটি বিষয়কে, হালাল- হারামকে, ঈমান-কুফুরকে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ও মুরাকাবার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করছিল, তখন ওলামায়ে দেওবন্দ উসূলে ফিকহ, উসূলে হাদীস ও উসূলে তাফসীর চর্চার মাধ্যমে শরীয়তের বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করার সর্ব চূড়ান্ত মেহনত করে গেছেন।

আর এভাবে প্রবল বেগে প্রবাহিত একটি স্রোতকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। সঠিক বুঝে কোন খাদ ছিল না। মনোবলে কোন দুর্বলতা ছিল না। ইখলাসের কোন অভাব ছিল না। প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিল না। কিছু দুর্বলতা থাকলে তা ছিল পর্যাপ্ত উপকরণের ক্ষেত্রে এবং পর্যাপ্ত লোকবলের ক্ষেত্রে। যে দুর্বলতা কখনো কোন কাজকে আটকে রাখতে পারে না এবং পারেনি।

বিদআতের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া এবং মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আকাবিরে দেওবন্দের স্বরূপ ছিল এই। তাই শত্রু পক্ষের দাবি সঠিক নয়। শত্রুপক্ষ বিদআতের অপনোদনে এমন কোনো অবদান রাখেনি যার ভিত্তিতে তারা আজ ওলামায়ে দেওবন্দের এত বড় অবদানকে খাট করে দেখতে পারে।

আত্মকথা:

তবে শত্রু পক্ষের দাবি না থাকলেও দ্বীনের খাতিরে এবং পরকালে মুক্তি পাওয়ার দাবিতে যে সত্যগুলো আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে তা হচ্ছে, বিদআত থেকে আমরা পরিপূর্ণ মুক্ত নই। বর্তমানের আকাবিরে দেওবন্দের প্রথম সারির কারো কারো মুখ থেকে এ ধরনের কথা না শুনলে হয়ত এতটা অকপটে আমি বলতে সাহস করতাম না। তাঁরা কথাটি আরো কঠিন করেই বলেছেন। বিদআতের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব একেবারেই কমে গেছে বলে তারা দাবি করেছেন।

আমি ছোট হিসাবে এত বড় দাবি করছি না। তবে বিদআত থেকে আমরা মুক্ত নই চাই তা আমল হোক বা বিশ্বাস হোক -এ বাস্তবতাটুকু স্বীকার করে নিতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। দুর্বলতার দিকগুলো আলোচনা করলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে বলে মনে করছি।

মূলত আকাবিরে দেওবন্দ মুছতে মুছতেও যে অসারতাগুলো রয়ে গেছে, সেগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ তাদের প্রতীক বানিয়ে ফেলেছে। অথচ **সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজগুলো উত্তরসূরিদের দায়িত্বকে বাড়িয়ে দেয়, অজুহাতের রাস্তা খোলে না। শত্রুর জন্যও না, মিত্রের জন্যও না।**

এক্ষেত্রে যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করা হয় তার কিছু আছে এমন যা নিয়ে দলিল ভিত্তিক বিতর্ক রয়েছে। কিছু আছে এমন যা ইচ্ছা থাকলেও পরিপূর্ণ মূলোৎপাটন সম্ভব হয়নি। আবার কিছু আছে এমন যা কারো কারো ব্যক্তিগত দুর্বলতার আওতায় পড়ে। যার ভিত্তিতে মূল চিন্তা-চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না। আর এমন কিছুও আছে যার ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দের স্বচ্ছ ধারণা থাকলেও বাচনিক দুর্বলতার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, যাকে تعبیری غلطی বা বলার ভুল বলা যায়।

কিন্তু কারণ যাই হোক এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, দলিল বহির্ভূত বিষয়গুলো অবশ্যই পরিহারযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে যত বেশি দলিলের কাছাকাছি থাকা যায় ততই নিরাপদ এবং মানহাজে দারুল উলূম দেওবন্দের সেটাই সঠিক অনুসরণ। এখন প্রজন্ম যদি এ পথটিকে পরিহার করে ভিন্ন পথ ধরে তাহলে অভিযোগ-আপত্তিগুলো গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করে নিলেই হয়। এর জবাব দেয়ার চিন্তা করার দরকার কি?! দুয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝে নিতে পারলে সহজ হবে আশা করি।

ক. হাল্লাজ মুক্তাদা না হলে সমস্যা কি?

হোসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ যাকে আমরা মানসূর হাল্লাজ বলে চিনে থাকি –তার ঈমান-কুফরের বিষয় নিয়ে যুগ যুগ ধরে বিতর্ক চলে আসছে। আকাবিরে দেওবন্দের কারো কারো মুখে তার ব্যাপারে ভালো মন্তব্যও শোনা গেছে, আবার অনেকের মুখে শোনা যায়নি।

অপর দিকে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে তার ব্যাপারে তিনটি তথ্য খুবই স্পষ্ট যা কেউ অস্বীকার করে না, তবে ইতিহাস না পড়ে থাকলে ভিন্ন কথা। তিনটি তথ্যের **প্রথম** তথ্যটি হচ্ছে, হাল্লাজ এমন কিছু কথা বলেছে যা স্পষ্ট কুফর এবং শরয়ী উসূলের আলোকে তার কোন ব্যাখ্যা চলে না। **দ্বিতীয়** তথ্যটি হচ্ছে, তার এ কুফরী কথা, কাজ ও বিশ্বাসের কারণে তার প্রধান তিন শায়খ: শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী, শায়খ আমর ইবনে উসমান ও শায়খ আবু ইয়াকুব রাহিমাহুমুল্লাহ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় তথ্যটি হচ্ছে, তার এ কুফরী বক্তব্য ও আচরণগুলোর

কারণে তৎকালীন সকল মুফতিয়ানে কেরামের ঐক্যমতে তাকে যিন্দীক সাব্যস্ত করে হত্যার রায় দেয়া হয়েছে এবং তা কার্যকর করা হয়েছে।

কিন্তু সে নিজেকে মুসলমান এবং আল্লাহর সঙ্গে তার ইশকের দাবি করার কারণে তাকে নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। অস্পষ্টতার বীজ রয়েই গেছে।

এমতাবস্থায় হাল্লাজকে যদি যিন্দীক মনে না করে কমপক্ষে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবুও তাকে দ্বীন ও শরীয়তের মুক্তাদা বা অগ্রপথিক হিসেবে উপস্থাপন করার বৈধতা কতটুকু এবং এর প্রয়োজন কতটুকু! যদি শরীয়তের দলিলের আলোকেই তাকে যিন্দীক বলা হয়ে থাকে তাহলে এর বিপরীতে কোন দলিলের আলোকে তাকে আল্লাহর আসল বান্দা বলা হবে? হাল্লাজ যদি তার ভিতরগত ঈমানের কারণে বেহেশতে চলে যায় তবু শরীয়তের সকল দলিলকে উপেক্ষা করে তাকে সঠিক মুমিন বলে উপস্থাপন করার বৈধতা কীভাবে সাব্যস্ত হয়?

খোদায়ী দাবিদারদের বিচারের মানদণ্ডঃ

কুরআন-হাদীসে বিশ্বাসী শরীয়তের একজন আলেম শরীয়তের কোন দলিলের আলোকে বুঝতে পারলেন, হাল্লাজ 'আনাল হক্ব' বলে বেহেশতে চলে গেছে, আর ফেরাউন 'আনাল হক্ব' বলে জাহান্নামে চলে গেছে। নাকি স্বপ্ন, কাশফ ও মোরাকাবার মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা গেছে। যদি তাই হয় তাহলে শরীয়তের সকল দলিল এবং মুজতাহিদীনের সকল ইজতেহাদের বিপরীতে বাতেনী মতবাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম করে দেয়ার দায় দায়িত্ব কে নেবে?

আর যদি হাল্লাজের বিষয়গুলোকে খিজির আলাইহিস সালামের পদ্ধতিতে আমরা বিচার করি, তাহলে আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার দাবি করব কেন? আর মুহাম্মদী শরীয়তের উপর রচিত পাঠ্যসূচির উপর কেন নিজেদের জীবনকে শেষ করে দেব?

দেওবন্দ ও দেওবন্দী আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বড় মাপের একজন তাঁর রচনায় হাল্লাজের কুফরী কথাবার্তা ও সে কারণে তাকে যিন্দীক ফতোয়া দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

"হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. এর মুরিদ ছিলেন মানছুর হাল্লাজ রহ.। তাঁর 'আনালহক' (আমিই খোদা) বাক্যটি সালেকীনদের জন্য ঘন্টার আওয়াজ স্বরূপ ছিল। (তাঁর 'আনালহক' এর বাস্তব অর্থ জগতের মানুষ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকিয়ে তাঁকে আল্লাহদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল এক শ্রেণীর মানুষ। এক পর্যায়ে) ৩০৯ হিজরী সনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ ঘটনার একশ' বছরের মধ্যেই তাসাওউফের কিতাবাদি আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়"।

উল্লেখ্য, বন্ধনির লেখাগুলোও মূল বইয়ের।

অসহায় ফাতওয়াঃ

দারুল উলূম দেওবন্দেরই একজন সন্তান হিসাবে আমি এ প্রশ্ন করার অধিকার রাখি কি না যে, আজকে দেওয়ানবাগী যদি 'আমিই খোদা' বলে দাবি করে তা হলে তাকে কাফের বলা হবে কি হবে না? যদি কাফের বলা হয় তাহলে তা যাহেরী ইলমের ভিত্তিতে বলা হবে নাকি বাতেনী ইলমের ভিত্তিতে বলা হবে? যদি কেউ বাতেনী ইলমের ভিত্তিতে তাকে বেহেশতী বলে এবং আল্লাহর খাঁটি ওলী বলে তা হলে তা গ্রহণ না করার কী অধীকার আমাদের আছে? তার এ দাবিকে বর্জন করতে হলে যাহেরী ইলমের ভিত্তিতেই বর্জন করতে হবে। অথচ বাতেনী ইলমের সামনে তো যাহেরী ইলমের কোন শক্তিই নেই।

দ্বিতীয়ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যদি কোনো ব্যক্তি 'আমিই খোদা' দাবি করত তা হলে তিনি তাকে কাফের বলতেন না মুসলমান বলতেন? যদি কাফের বলতেন তা হালে কোন ইলমের ভিত্তিতে বলতেন? খোদ আপনার সামনে যদি কেউ 'আমিই খোদা' বলে দাবি করে তা হলে আপনি তার ব্যাপারে কী ফায়সালা দিবেন এবং তা কোন ইলমের ভিত্তিতে দেবেন?

যদি যাহেরী ইলমের ভিত্তিতে ফতোয়া দেবেন হয় এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে আপনার উপর এটাই ওয়াজিব দায়িত্ব, তা হলে হাল্লাজকে যারা কাফের ফতোয়া দিয়েছেন তাঁরা যাহেরী ইলমের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন বলে যে ধাক্কাটা দেয়া হয়েছে তা কি সঠিক হয়েছে?

অসহায় ইতিহাসঃ

আরেকটি ধাক্কা দেয়া হয়েছে 'এক শ্রেণির আলেম' বলে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এক শ্রেণির আলেম শব্দটি কোথায় ব্যবহৃত হয়? ইসলামের ইতিহাসে লেখা আছে ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফাতাওয়া দিয়ে হত্যার হুকুম জারি করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আলামিন নুবালা কিতাবে হাল্লাজের হত্যা বিষয়ে লিখেছেন وَقَدْ قُتل بِإِجْمَاع فُقَهَاء عصره، فَأَصَابُوا وَأَخطَأَ هُوَ وَحده. (সমসাময়িক ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করা হয়, তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আর সে একাই ভুল করেছে)। ইমাম জাসসাস, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম ইবনে হাজার প্রমূখ রাহিমাহুমুল্লাহ একই কথা বলেছেন।

এমতাবস্থায় এক শ্রেণির আলেম বলে ধাক্কা দেয়ার অধিকার আমরা কোথায় পাই? আর কেনই বা এমন কথা বলতে যাই?

বলতে চাই, এমন কথা কেন বলব যা আমার দায়িত্বে পড়ে না এবং যা বিদআতের প্রচারকে বেগবান করে দেবে এবং একটি সহীহ মানহাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে? এমন কথা কেন বলব যা কুফর ও বিদআতের সকল রাস্তাকে খুলে দেয়?

খ. গণ্ডি ঠিক রাখা চাইঃ

তাযকিয়া নফসের প্রচলিত তাসাওউফের পদ্ধতির কতটুকু প্রয়োজনীয় আর কতটুকু ঐচ্ছিক এ বিষয়ে ওলামায়ে দেওবন্দ বিভিন্নভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর কতটুকু শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত, কতটুকুর সঙ্গে কোন বৈপরীত্য নেই, আর কতটুকু সাংঘর্ষিক এসব কিছু আকাবিরে দেওবন্দ থেকে বর্তমান ওলামায়ে দেওবন্দ পর্যন্ত অনেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এরপরও কোন কোন পর্যায়ে গিয়ে প্রজন্মের কেউ কেউ যেন বিষয়গুলোর মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। তাযকিয়া নফসের অভিজ্ঞতালব্ধ এ বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করাকে 'বড় জিহাদ' আখ্যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে জিহাদের ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হচ্ছে। একে

ইলমের আসল পদ্ধতি বলে ইলমের ফরয দায়িত্ব পালনে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে। ইলম হাসিল করলে অহংকার সৃষ্টি হয় বলা হচ্ছে। অনায়াসে বলা হচ্ছে, ইলম হাসিল করলে কলবে দাগ পড়ে যায়। কুরআন, হাদীস, ফিকহ হচ্ছে ইলম। আর ইলমের কারণে কালো দাগ সৃষ্টি হয় -এ আকীদার ফলাফল কী?!! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আকাবিরে দেওবন্দ ও মানহাজে দেওবন্দের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?!

গ. অনিয়ন্ত্রিত কথা ক্ষতিকর:

দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ যদি ভরা মজলিসে নিজের শায়খের ব্যাপারে দাবি করেন 'আমার শায়খ জীবনে কখনো সগীরা গুনাহও করেননি'। কেউ যদি মোটাতাজা হওয়ার কারণে হাদীস দিয়ে প্রমাণ করেন 'মোটা হওয়া সুন্নাত', আবার কেউ চিকন হওয়ার কারণে হাদীস দিয়ে প্রমাণ করেন চিকন হওয়া সুন্নত।

কেউ যদি লিফটে চড়ার কারণে মেরাজের হাদীস দিয়ে প্রমাণ করেন লিফটে চড়া সুন্নত, আবার কেউ গল্পপ্রেমিক হওয়ার কারণে এশার পর থেকে ভোর পর্যন্ত গল্পের আড্ডা জমানোকে সুন্নত বলে প্রমাণ করেন। বিশেষ পদ্ধতির টুপি, বিশেষ পদ্ধতির জামা, বিশেষ পদ্ধতিতে কথা বলার ভঙ্গি এবং বিশেষ পদ্ধতিতে চলার গতিকে যদি কেউ সুন্নত বলে দাবি করে বা দাবি করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে -তা হলে এসবের কারণে আহলে দেওবন্দ বা মানহাজে দেওবন্দের উপর আপত্তি আসা বড় অন্যায়।

ঘ. দলিলের কথা মনে রাখতে হবে:

প্রজন্মের কেউ যদি মনে করে মাকবারায়ে কাসেমীতে গিয়ে দোয়া করলে দোয়া বেশি কবুল হবে, মুলসরীর কলের পানি পান করলে ইলমের মাঝে নূরানিয়্যাত সৃষ্টি হবে, শায়খুল হিন্দ ও শায়খুল ইসলাম রাহিমাহুমাল্লাহর জোড়া কবরের সামনে মোরাকাবা করে রাত কাটালে বিশেষ মকাম অর্জিত হবে এবং এ সকল মনে করার পেছনে কোন প্রকার দলিলের সমর্থনের প্রয়োজনবোধ না করে, তা হলে এর দায়দায়িত্ব আকাবিরে দেওবন্দের উপর বর্তাবে না। দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন ব্যক্তিই এর জবাব দিতে বাধ্য নয়। বরং এমন হয়ে থাকলে এর সংশোধনই হওয়া চাই।

হওয়া জরুরী। এসব ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের জবাব দেয়ার চাইতে নিজেদের সংশোধন করা ওয়াজিব দায়িত্ব।

ঙ. মানদণ্ড মানা চাই:

বোধগম্য নয় এমন কথা দিয়ে তাবিজ তৈরি করা, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ বিকৃত করে ঝাড়-ফুঁক দেয়া, মাসূর দোয়া ও পদ্ধতির বিপরীতে গায়রে মাসূর দোয়া ও পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয়া, ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রকৃতিকে অনুসৃত পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা এবং গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা, শায়খের কোন আচার-আচরণ শরীয়ত বিরোধী মনে হলে সে বিষয়ে খটকা দূর করার চেষ্টা করাকে বেয়াদবি মনে করা, হালাল-হারাম ও ঈমান-কুফর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করাকে বা জানতে চাওয়াকে বেয়াদবি মনে করা -এ বিষয়গুলো কখনো ওলামায়ে দেওবন্দের মানহাজ হতে পারে না।

সন্দেহকে জিইয়ে রাখা যাবে না:

শায়খুল ইসলাম মাদানী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দে শায়খুল হাদীস থাকা অবস্থায়ও প্রায়ই সফরে থাকতেন। মাদরাসা থেকে বেতনও নিতেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর মনে খটকা লেগেছে। তিনি আদবের সাথে জিজ্ঞেস করে ফেলেছেন, সন্তোষজনক জবাব পেয়েছেন, খটকাও দূর হয়ে গেছে। প্রজন্মের কারো কারো মতে খটকা লাগাটাই অন্যায়। দলিলের আলোকে হলেও অন্যায়। এ বিষয়গুলো ব্যক্তিবিশেষের দুর্বলতা ও প্রজন্মের দুর্বলতা। দেওবন্দ ও দেওবন্দের মানহাজ এর জন্য দায়ী নয়।

সংস্কারের স্বভাব:

দেখুন, সংশোধন ও সংস্কার হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা কখনো এক পর্বে পূর্ণতা লাভ করে না। উদ্ভাবক মূলনীতি দিয়ে যান, পদ্ধতি দিয়ে যান, আর আংশিক বাস্তবায়ন করে যান। সহকর্মী ও প্রজন্মের দায়িত্ব হচ্ছে, একটি একটি ধাপ করে এ চলমান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রজন্ম যদি সে দায়িত্ব ভুলে গিয়ে রেখে যাওয়া দুর্বলতাগুলোকে দলিল বানিয়ে তারই প্রচার করতে থাকে তা হলে সে উত্তরসূরি হওয়ার যোগ্য

নয়। আর শত্রুপক্ষও তাকে সঠিক উত্তরসূরি মনে করে পূর্বসূরিদের উপর আঘাত করা অন্যায়।

দেখুন স্পষ্ট হওয়ার জন্য কথাটি আমি আবারো বলছি, সংশোধন ও সংস্কার হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা কখনো এক পর্বে পূর্ণতা লাভ করে না। উদ্ভাবক মূলনীতি দিয়ে যান, পদ্ধতি দিয়ে যান, আর আংশিক বাস্তবায়ন করে যান। সহকর্মী ও প্রজন্মের দায়িত্ব হচ্ছে, একটি একটি ধাপ করে এ চলমান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রজন্ম যদি সে দায়িত্ব ভুলে গিয়ে রেখে যাওয়া দুর্বলতাগুলোকে দলিল বানিয়ে তারই প্রচার করতে থাকে তা হলে সে উত্তরসূরি হওয়ার যোগ্য নয়। আর শত্রুপক্ষও তাকে সঠিক উত্তরসূরি মনে করে পূর্বসূরিদের উপর আঘাত করা অন্যায়।

আল্লাহ পাকের শোকর! দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ আজো পর্যন্ত বিদআতের বিরুদ্ধে সোচ্চার। দলিলের আলোকে তাঁরা বিদআতের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু বিদআতের এ বিরোধিতার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমরা বিদআতের সংজ্ঞা ভিত্তিক বিদআত নির্ণয় করার পরিবর্তে পূর্ব নির্ধারিত কয়েকটি বিদআতকেই বিদআত জ্ঞান করতে পছন্দ করি। আমাদের আকাবির ও আসলাফ যে বিষয়গুলোকে বিদআত বলে চিহ্নিত করে গেছেন এর বাইরে কোন বিদআতকে আমরা বিদআত বলতে রাজি নই।

অথচ এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়কে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। একটি বিষয় হচ্ছে, বিদআত প্রতিনিয়ত আবিষ্কার হয়ে চলেছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীতে যত বিদআতী বিষয় রয়েছে তার প্রত্যেকটির উল্লেখ আকাবির ও আসলাফের লিখনীতে এসে গেছে এমনটি ধারণা করার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

বিষয়টি যখন এমনই তখন উত্তরসূরিদের দায়িত্বে এ কথা আসে যে, তারা বিদআতের সংজ্ঞার আলোকে আকাবির ও আসলাফের অনুসৃত পথে প্রত্যেকটি বিদআতকেই বিদআত বলে চিহ্নিত করবে, উম্মতকে সে বিদআত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

এ ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যে, পূর্বসূরিদের ব্যক্তিবিশেষ কোন একটি বিদআতকে বিদআত মনে করতেন না, কিন্তু আকাবিরের জামাত সেটিকে বিদআত মনে করতেন এবং তা বিদআত হওয়ার পক্ষে দলিলও বিদ্যমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একজন উত্তরসূরি তখনই সঠিক উত্তরসূরি হবেন যখন তিনি ঐ বিদআতকে বিদআত হিসাবেই জ্ঞান করবেন। এ বিষয়ে কোন প্রকার দুর্বলতার স্বীকার হওয়া কাম্য নয়।

মানতে বাধা নেইঃ

বিদআত প্রসঙ্গে আকাবিরে দেওবন্দের উপর যেসব হামলা করা হয় সেগুলোর অনেক রয়েছে 'বলার ভুল' প্রকারের। কিছু শব্দ ও পরিভাষা দূর অতীত কাল থেকে এত বেশি চর্চিত হয়ে এসেছে যে, অনিচ্ছা ও অবচেতন মনেই সেগুলো বেরিয়ে আসে। আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে যার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। যাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক থাবা।

যেমন শিয়া ইমামিয়ার ধারণাভিত্তিক বার ইমামের নাম নেয়ার ক্ষেত্রে 'ইমাম' শব্দ চলে আসা, আব্দুল কাদের জীলানীর সঙ্গে 'গাউসে পাক' শব্দ চলে আসা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'নূরের নবী' বলে সম্বোধন করা, ভারি কিছু তুলতে গিয়ে 'ইয়া আলি' মুখ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া, মহরে ফাতেমী নামে একটি মহরের ব্যাপক প্রচলন লাভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু শব্দ ও বিষয় রয়েছে যা শুধুই বলার ভুল। শব্দগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে বিশ্বাসের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়গুলো শতভাগ পরিহারযোগ্য। মুছতে মুছতেও এসবের যা এখনো রয়ে গেছে সেগুলো আমাদের জন্য দলিল হতে পারে না। দুর্বলতাকে যদি কেউ দলিলের স্থান দেয় তাহলে সে নীতিবহির্ভূত কাজ করেছে। এ ধরনের পদস্খলন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

অভিযোগ- ৩: জিহাদি চেতনার বিস্মৃতি

অভিযোগ আনা হয়েছে ওলামায়ে দেওবন্দ জিহাদবিরোধী শক্তি।

জবাবঃ

এ অভিযোগ শতভাগের দুই শতভাগই মিথ্যা অপবাদ। নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে এমন একটি দলের প্রধান ভারত উপমহাদেশের জিহাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আগাগোড়া শুধু নিজের ঘরের কথা বলে গেছেন। আকাবিরে দেওবন্দ জিহাদ নামক বিষয়টিকে চিনতেন এতটুকু আভাস দিয়ে দেয়ার মত সৎ সাহসও তার হয়নি।

যাই হোক এটাতো একটি ভ্রষ্ট দলপতির কথা। বাস্তব ইতিহাস হচ্ছে, জিহাদের সেনাপতি ও সৈনিকরাই দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। মুজাহিদীনের একটি দল কাফেরদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে হেরে মূলত إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة (যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন বা দলে স্থান লওয়া) -এর উপর আমল করতে গিয়েই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর মাধ্যমে কিছু যোগ্য সৈনিক সংগ্রহ করে নতুন উদ্যমে আক্রমণ করার জন্যই তাঁরা তাবুতে ফিরে এসেছিলেন।

সে সেনা ছাউনীতে এমন সৈনিক তৈরি হয়েছে যারা এ পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ দেয়ার মানসিকতা নিয়ে তৈরি হয়েছেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। জিহাদের নকশা তৈরি করেছেন এবং সে ছক অনুযায়ী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। কুফরী শক্তির গৃহপালিত মানবের পাল হিসাবে শুধু বেঁচে থাকার জন্য যখন গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও আহমদ রেজা খান বেরেলভীর মত দালাল শ্রেণীর লোকেরা কাফেরদের শাসিত দেশকে দারুল ইসলাম প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন ওলামায়ে দেওবন্দই তা প্রত্যাখ্যান করে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের পথে অগ্রসরমান ছিলেন।

ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, কাদিয়ানী-বেরেলভীরা জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া জারি করে, জিহাদকে সন্ত্রাস, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা,

বিশৃংখলা ও জঙ্গিবাদ আখ্যা দিয়ে ইহুদী-খ্রিস্টানদের কৃপা লাভ করে সকাল-সন্ধ্যার খড়, ভুষি, কুঁড়ো ও খইল পাওয়ার চেষ্টা করেছে। আর ওলামায়ে দেওবন্দ কুফরী শক্তির রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে হাজার বদনামের বোঝা মাথায় নিয়েও আল্লাহর কৃপা লাভ করার চেষ্টা করেছেন। এটাই হচ্ছে ইতিহাস এবং সত্য ইতিহাস।

আলহামদুলিল্লাহ! আকাবিরে দেওবন্দের উত্তরসূরিরা আজো সে স্বপ্ন লালন করছে, তার বাস্তবায়নের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। জিহাদের ফরয দায়িত্ব কীভাবে আদায় করা যায় হন্যে হয়ে সে পথ খুঁজে চলেছে। তাই দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দকে জিহাদের বিরুদ্ধ শক্তি বলে যে অপপ্রচার চালানো হয়েছে তার আগা গোড়াই মিথ্যা।

একটি ফলাফলশূন্য বিতর্ক:

এখানে অপ্রয়োজনীয় একটি বিতর্ক আছে। সে দিকে সামান্য ইঙ্গিত না করলে একটু ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে। বিতর্কটি হচ্ছে, দারুল উলূম দেওবন্দ তালীমের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে না জিহাদের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? একটি পক্ষ বলছে জিহাদের একটি নতুন কৌশল হিসাবে তালীমের পথকে বেছে নেয়া হয়েছে। আরেকটি পক্ষ বলছে, জিহাদ সম্ভব নয় বলে তালীমের পথে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমি শুরুতেই বলেছি এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক। যে পক্ষ মনে করছেন, জিহাদের প্রস্তুতির জন্য দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের তো জিহাদ থেকে ছুটি নেই, এটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু যারা মনে করেন দারুল উলূম দেওবন্দ তালীমের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা কি জিহাদ থেকে ছুটি পেয়ে গেছেন? উভয় পক্ষ মনে হয় এ কথাই মনে করছে যে, যদি এ কথা প্রমাণিত হয়, দারুল উলূম দেওবন্দ তালীমের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকদের উপর কখনো জিহাদ ফরয হবে না। কারণ তাঁরা তালীম নিয়ে আছেন এবং আসল উদ্দেশ্যের উপর অবিচল আছেন।

এ বিষয়টি লিখতে সত্যই বিরক্তি লাগছে। তর্কবাগিশরা তো তর্কে জেতার জন্য এ নিয়ে সময় ব্যয় করতে আগ্রহবোধ করবেন। কিন্তু আমি কেন এর

জন্য সময় ব্যয় করব? মসজিদে নববী নামাযের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে না জিহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? বলাবাহুল্য, নামাযের জন্য। সুফফা তালীমের জন্য তৈরি হয়েছে না জিহাদের জন্য? বলাবহুল্য, তালীমের জন্য। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম জিহাদসহ শরীয়তের সকল বিধিবিধান এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন না অন্য কোথাও থেকে? নামায এবং তালীম ব্যতীত আর সকল ফরয ওয়াজিব আমল এখান থেকে পরিচালিত হয়েছে না অন্য কোথাও থেকে?

দারুল উলূম দেওবন্দ তালীমের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা কি বোঝাতে চাই? দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মূল কাজ হচ্ছে তালীম। অন্য কোন দিকে নযর দেয়া তাদের উদ্দেশ্য পরিপন্থি। এ কথা বোঝাতে চাই? ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

দারুল উলূমের দরসগাহ থেকে যদি নামায পড়া ফরয প্রমাণিত হয় এবং সে ফরয দারুল উলূমের ওলামা-তালাবার উপরই ফরয হয়, তাহলে এ দরসগাহ থেকে জিহাদ ফরয প্রমাণিত হলে সে ফরয কার উপর হবে? ফরযে কেফায়া ও ফরযে আইনের হাজারো মাসআলা এ দরসগাহের তালীমের ভিত্তিতেই ওলামা ও তালাবার উপর ফরয হচ্ছে এবং সে ফরয দায়িত্ব আদায় করাকে জরুরী মনে করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে কোন ফরয আমলই দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী মনে হচ্ছে না। দাওয়াত ও জিহাদের মাসআলা আসলে একে তালীমের পরিপন্থী মনে করা হচ্ছে। এর কারণ কী?

তালীমের দরসগাহের দাবি তো হচ্ছে, এর ইলম যে আমলকে ফরয বলবে তা ফরয, যার উপর ফরয বলবে তার উপর ফরয, যখন ফরয বলবে তখন ফরয, যার বিরুদ্ধে ফরয বলবে তার বিরুদ্ধে ফরয, যে পদ্ধতিতে ফরয বলবে সে পদ্ধতিতে ফরয। তালীমের দরসগাহ ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা হবে কেন? ইলমের কাছে আমরা আমাদেরকে ন্যস্ত করে দেই। আবেগকে ইলমের অনুকূলে কাজে লাগাই। ইলমের বিরুদ্ধে আবেগকে প্রশ্রয় না দেই। এটা এক ভয়ংকর খেলা। আমরা খেলা করে চলেছি। তামাশা করার মত আর সহজ কোন বিষয় খুঁজে পাইনি।

অতএব ওলামায়ে দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের জিহাদের এ সোনালী ইতিহাসের যতটুকু অবমূল্যায়ন আমাদের দ্বারা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে সে দিকটি নিয়েও কিছুটা আত্মসমালোচনা করা যায়।

উত্তরসূরিদের জিহাদ ভাবনা:

প্রথমে বলা যায়, উল্লেখযোগ্য হারে আমাদের মাঝে জিহাদী চেতনার বিস্মৃতি ঘটেছে। আকাবিরে দেওবন্দ যুদ্ধের ময়দান থেকে কেন তাবুতে এসেছিলেন, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাবুর লোকেরা তা ভুলে গেছে। প্রজন্ম বা প্রজন্মের একটি অংশ মনে করছে তাবুর জীবনই জীবন। **বিভিন্ন অজুহাতে এ ফরয দায়িত্বকে কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় তার কৌশল খুঁজতে প্রজন্মের যে মেধা ব্যয় হয়েছে, তার শতভাগের এক ভাগ যদি** وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة **(শত্রুর মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখ) এর পেছনে ব্যয় হত তাহলে জিহাদের সাজানো গোছানো একটি রূপ এখন আমাদের হাতে থাকতো।** প্রজন্মের নিজস্ব তৈরি এ চিন্তা-চেতনার কারণে আজ পূর্বসূরিরা বদনামের ভাগী হচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমরা বড় ধরনের তিনটি অপরাধে অপরাধী-

ক. আমরা ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার গুনাহে সার্বক্ষণিক লিপ্ত। খ. ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার অপরাধকে ঢাকার জন্য কুরআন, হাদীস, ইজমা, কেয়াস ও মুজতাহিদীনের হাজার দেড় হাজার বছরের ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাতকে বিকৃত করার জঘন্য গুনাহে লিপ্ত। গ. পূর্বসূরিদেরকে বদনাম করার অপচেষ্টার গুনাহে লিপ্ত।

কিছু অজুহাত:

জিহাদের এ ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কাল্পনিক যে অজুহাতগুলো আমরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে চলেছি সেগুলোর প্রতি খুব সংক্ষিপ্তাকারে ইঙ্গিত দিয়ে যেতে চাই। বিস্তারিত দালিলিক আলোচনার দায়িত্ব মুহাককিক ওলামায়ে কেরামের হাতেই ন্যস্ত রইল।

১. জিহাদ ফরযে কেফায়াঃ

অতএব এটা নিয়ে আমার আপনার ভাবার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ফরযে কেফায়া নিয়ে ভাবার দায়িত্ব কার। বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে এ আওয়াজই আসছে যে, এটা ফরযে কেফায়া। আখের ফরযে কেফায়া ফরয বিষয় না ঐচ্ছিক বিষয়? ফরযে কেফায়া বলে যেভাবে আমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই মনে হয় ফরযে কেফায়া অর্থ হচ্ছে ঐচ্ছিক।

আসলে ফরযে কেফায়া বিষয়টি কি এমন নয় যে, তা যদি কোন দল বা গোষ্ঠীর দ্বারা আদায় না হয় তাহলে তা অপর দলের উপর ফরয হয়ে যায়, আর এভাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর তা ফরয হয়। কোন একটি দল বা গোষ্ঠী যদি সে ফরয দায়িত্বটি আদায় না করে বা করতে না পারে, বা করেছে কিন্তু সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে হয়নি -এ সকল অবস্থায় ফরয দায়িত্বটি অবশ্যই অপর দলের উপর ফরয হয়ে যাবে।

বিষয়টি যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে আমরা যখন বলছি জিহাদ ফরযে কেফায়া তখন সে ফরযে কেফায়াটি কারো দ্বারা আদায় হচ্ছে কি না সে খবর কি আমি কখনো নিয়েছি?! যদি কারো দ্বারা হয়ে থাকে তা হলে সে দলটি কোনটি তা কি আমরা চিহ্নিত করেছি বা এ বিষয়ে কোন খবর নিয়েছি? এ খবর নেয়া ফরয কি না? যদি কেউ আদায় না করে থাকে বা সঠিক পদ্ধতিতে না করে থাকে তাহলে ফরযটি আমার-আপনার উপর এসে পড়েছে। আর যদি কেউ সঠিকভাবে তা করে থাকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ না হয়ে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গ দেয়া আমার-আপনার উপর ফরয। আর যদি যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা আমার-আপনার দায়িত্ব।

এখন আমরা কোন পথে আছি। যদি এ নিয়ে না ভাবি, শুধু জিহাদ ফরযে কেফায়া বলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই তাহলে দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের শত্রুপক্ষ বলতেই পারে যে, আমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত খুঁজছি।

এরপর এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা জিহাদকে যে ফরযে কেফায়া বলছি, এ বলার ক্ষেত্রে আয়াত, হাদীস, মুজতাহিদীনে কেরামের ইস্তেম্বাত এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যথাযথ অধ্যয়ন করে বলছি? নাকি প্রথাগতভাবে শুনে আসছি আর বলছি? বিশ বছর আগে শুনেছি আর বিশ বছর পরে বলছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তারা জিহাদের মাসআলা এবং তার শর্তাবলী নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক কথা বলেন, কিন্তু দলিলের আলোকে কথা বলার অনুরোধ করলে তারা বলেছেন বিষয়টিকে ওইভাবে তলিয়ে দেখিনি। এমন একটি মাসআলা সম্পর্কে তলিয়ে দেখা কি মুফতিয়ানে কেরামের দায়িত্বে পড়ে না? আমরা যেসব মাসআলা নিয়ে বর্তমানে সময় ব্যয় করছি সে সব মাসআলার তুলনায় এ মাসআলাটি কি একেবারেই গুরুত্বহীন? যদি গুরুত্বহীন হয়ে থাকে তা হলে কুরআন-হাদীসে বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দেয়া হল কেন? গুরুত্ব পাওয়া না পাওয়ার মাপকাঠিই বা কী?

২. জিহাদ করার মত সামর্থ্য আমাদের নেই:

প্রশ্ন হচ্ছে, কতটুকু সামর্থ্য থাকলে জিহাদ করতে হয় সে সম্পর্কে আয়াত, হাদীস ও ফিকহের কিতাবাদিতে বিস্তারিত বলা আছে। আমরা কি আমাদের সামর্থ্যের পরিধি সম্পর্কে খবর নিয়েছি? এরপর কিতাবের মাসআলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি? কাফেরদের শক্তির মোকাবেলায় বদর যুদ্ধের সামর্থ্য, মুতার যুদ্ধের সামর্থ্য, বালাকোটের যুদ্ধের সামর্থ্যের সঙ্গে আমাদের সামর্থ্যকে তুলনা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করছি না, করার প্রয়োজনবোধ করছি না।

প্রস্তুতি প্রসঙ্গ:

দ্বিতীয়ত: এ কথা যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আমাদের সামর্থ্য নেই তাহলে কি জিহাদ বিষয়ক কার্যক্রম থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব? তখন কি প্রস্তুতির দায়িত্ব আমার উপর আসবে না?

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

অর্থঃ শত্রুর মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ, যাতে করে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পার।

এ ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কী অজুহাত দাঁড় করাব? প্রস্তুতিতো এমন এক দায়িত্ব যা থেকে কখনো মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা নেই। কারণ পরিস্থিতি যেমন প্রস্তুতিও তেমন। আর সে প্রস্তুতি কখনো তা'লীম, তাযকিয়া ও তাবলীগ নয়। সে প্রস্তুতি হচ্ছে সরাসরি যুদ্ধের প্রস্তুতি। من قوة এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেছেন। رباط الخيل সে কথাই বলে। ترهبون به عدو الله শব্দাবলী একেবারেই স্পষ্ট, অপব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই। আকাবিরে দেওবন্দ তো প্রস্তুতি জারি রেখেছেন, জারি রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা আমাদের আকাবির থেকে যে আদর্শ পাই তা হচ্ছে এই-

আকাবিরের ভাবনা:

"আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে আমার নিশানাবাজীর শখ বাল্যকাল থেকে। ধাপে ধাপে বন্দুক, রিভলবার ও রাইফেলের প্রশিক্ষণও আমি গ্রহণ করি। শ্রদ্ধেয় পিতা (হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব রহ.) লাইসেন্স করে আমাকে কয়েকটি অস্ত্র এ জন্যই জোগাড় করে দিয়েছিলেন, যেন শিকারের মাধ্যমে অনুশীলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তাঁর ওফাতের পর এখন বিভিন্ন দায়িত্ব ও ব্যস্ততার ভীড়ে সে অনুশীলন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, এ জন্য সব সময় নিশানাবজীর সুযোগের অপেক্ষায় থাকি।" [আল্লাহর পথের মুজাহিদ, মুফতী রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুম পৃ: ১৫০-১৫১]

তিনি আরো বলেন-

"তারা আমাদের সবাইকে তখনই ক্লাসিনকোভ ব্যবহারের জরুরী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে ক্লাসিনকোভ খুলে পরিষ্কার করা, পুনরায় জোড়া

লাগানো, গুলি ভরা এবং চালানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। লক্ষ্য ঠিক করার অনুশীলন তো উরগুন গিয়ে করতে হবে।"

আমার বন্দুক, রিভলবার এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কিছু অনুশীলন তো আগে থেকেই করা আছে এবং বিরতি দিয়ে দিয়ে সে অনুশীলন আলহামদু লিল্লাহ অব্যাহতও রয়েছে। কিন্তু ক্লাসিনকোভ ইতিপূর্বে শুধু দূর থেকেই দেখেছিলাম, ব্যবহারের সুযোগ এখানেই প্রথম পাই।

এটি দেখে আমি আনন্দিত হই যে, এর ওজন সাধারণ রাইফেলের ওজনের চেয়ে কম এবং এর ব্যবহার খুব সহজ, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। এর আরেকটি ভাল গুণ এই যে, ম্যাগজিন ভরা ত্রিশটি গুলি পৃথক পৃথকভাবে একটি একটি করে ফায়ার করেও ব্যবহার করা যায় এবং চাইলে এক সঙ্গে একই ফায়ারে ত্রিশটি গুলিই নিক্ষেপ করা যায়। [আল্লাহর পথের মুজাহিদ, মুফতী রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুম পৃ: ১১২-১১৩]

কিন্তু ইলমের ধারক বাহকগণ যদি অপব্যাখ্যা থেকে ইলমে দ্বীনকে রক্ষা না করে নিজেরাই অপব্যাখ্যা শুরু করে দেন, তাহলে অভিযোগ আল্লাহর দরবারে ছাড়া আর কোথায় করব? অবশেষে না জানি আমরা ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة (যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করত তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত) এর আওতায় এসে যাই। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এর কোন প্রয়োজন ছিল না:

ব্যাখ্যাকারীরা জ্ঞাতসারে বা অজান্তে যে সব অপব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন তার যে কয়েকটির খবর আমরা পাচ্ছি তার দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃতি ছাড়াই বোঝার সুবিধার্থে তুলে ধরছি। নাম-ঠিকানাসহ সনদভিত্তিক উদ্ধৃতি আমার কাছে আছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এর কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন সে কারণে উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি না। তবে পাঠক তার আশে পাশেই এসব অপব্যাখ্যার বাস্তবতা খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন।

ক. এক হাদীসের উস্তাদ, তিনি মুফতী এবং মাদরাসার মোটামুটি যিম্মাদারও। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

رباط ومن عدوكم وعدو الله به ترهبون الخيل (শত্রুর মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ, যাতে করে আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পার) আয়াতটির উপর আমরা কীভাবে আমল করতে পারি? উস্তাদ উত্তর দিয়েছেন এখন যদি কেউ প্রস্তুতি গ্রহণ করে তা হলে তার শিরকের গুনাহ হবে। এর পর এক ধাপ নিচে নেমে এসে বলেছেন, কবীরা গুনাহ হবে।

প্রশ্নকারীরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক আমল করলে শিরকের গুনাহ বা কবীরা গুনাহ হবে?! উস্তাদ কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, এতে তাওয়াক্কুলের খেলাফ হয়। প্রস্তুতি নেয়া মানে সে আল্লাহর উপর ভরসা করে না।

খ. এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সামনে জিহাদের প্রসঙ্গ আনা হলে তিনি বললেন, জিহাদ জিহাদ কর, জিহাদের কোন প্রস্তুতি আছে নাকি? তিনিই প্রস্তুতি প্রসঙ্গে অন্য এক সময় বলেছেন, আগে জিহাদের ময়দান তৈরি হোক, জিহাদ শুরু হোক তার পরে প্রস্তুতির কথা চিন্তা করা যাবে, এখন প্রস্তুতি গ্রহণ করে কী করবে? ফলাফল হচ্ছে, জিহাদ না হলে প্রস্তুতি নেয়া যাবে না, আর প্রস্তুতি নেয়া না হলে জিহাদ করা যাবে না। তার অর্থ হল, কখনো কোনটাই করা যাবে না। এভাবে আমরা অবধারিত ফরযকে এড়িয়ে যেতে পারলাম।

গ. একজন বলেছেন, নিয়ম হল জিহাদ শুরু হবে, এর পরে তিন মাস প্রস্তুতি হবে, এর পর জিহাদ হবে। জিজ্ঞেস করা হল, এত সুন্দর মাসআলার দলিল? বললেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। বলা হল, ঠিক আছে! মুসলমানরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে জিহাদের কোন আদর্শ খুঁজে পাচ্ছে না তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছাড়া তার উপায় কি?

ঘ. হাদীসের এক উস্তাদ إن الجنة تحت ظلال السيوف (নিশ্চয়ই তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত রয়েছে) এর তরজমা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন এখানে السيوف অর্থ হল ঢাল, আর ঢাল অর্থ প্রতিরোধ, আর প্রতিরোধ

মানে যে কোনভাবে প্রতিরোধ। যেমন- দাওয়াত, তাযকিয়া, তাবলীগ ইত্যাদি।

ঙ. একজন يقاتلون في سبيل الله (যারা আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধ করে) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন এখানে يقاتلون শব্দটি يجاهدون এর অর্থে, আর جهاد হল একটি ব্যাপক বিষয় যা দাওয়াত, তাবলীগ, তাযকিয়ার মাধ্যমেও হতে পারে।

চ. আরেক আল্লামা জিহাদের প্রত্যেকটি পর্বকে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও সন্ত্রাস বলে বলে এমনভাবে প্রচার করে চলছে যে, জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানরা পর্যন্ত অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। আর তাকে সহযোগিতা করে চলেছে বেখবর এক নির্বোধ কাফেলা। যাদেরকে সামান্য ধাক্কা দিলে বলে ওঠেন, বিষয়টাকে তো আসলে আমি এভাবে চিন্তা করে দেখিনি।

পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা সেরা কাফের ও কাফের গোষ্ঠীর ব্যাপারে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সে আয়াতগুলোকে প্রয়োগ করে চলেছে মুসলমানদের ক্ষেত্রে। যেসব আয়াতের হুকুম মানসূখ-রহিত হয়ে গেছে সেগুলোকে উপস্থাপন করে চলেছে নাসেখ-রহিতকারী আয়াতের বিরুদ্ধে। আয়াতে যদি কুফর শিরককে ফিতনা বলা হয়ে থাকে, তো সে ফিতনা বলছে কুফর শিরকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করাকে। আয়াতে যদি বলা হয়ে থাকে অমুসলিমের সঙ্গে মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে না তো সে ঐ আয়াত দিয়েই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে সকল কুফরী শক্তি হচ্ছে মুসলমানদের বন্ধু, ভালবাসার পাত্র।

আর তার এ সকল অপরাধকে বৈধতা দেয়ার জন্য, এ অপরাধের কালিমা দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের গায়ে মাখানোর জন্য নিজের নামের আগে পরে উপরে নিচে দেওবন্দ আর দেওবন্দিয়াতের আবরণে একাকার করে ফেলতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করছে না। আর এ সুযোগে দেওবন্দিয়াতের শত্রুপক্ষ এ মহান কাফেলার বিপক্ষে এক হাত নিয়েছে। তারা অনায়াসে বলে দিয়েছে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জিহাদকে সন্ত্রাস বলে দোষ করেছে, বেরেলভী জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দোষ করেছে, আর

দেওবন্দী আল্লামা বিশ্বব্যাপী জিহাদকে হারাম ঘোষণা দিয়ে কোন দোষ করেনি?!

হাত জোড় করে বলব, একটু ইনসাফ করুন। একজন বিচ্যুত মানুষ কখনো একটি আলোর কাফেলার পরিচায়ক হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে যদি কোন মিথ্যাবাদী জাল হাদীস তৈরি করে তা হলে সে মিথ্যুকেরই জাহান্নাম ওয়াজিব হবে।

এ হচ্ছে ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কিছু অপব্যাখ্যা বা তাহরীফের নমুনা। এসকল অপব্যাখ্যার এখন জোয়ার চলছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে সে সকল উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এবার আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গে যাব ইনশাআল্লাহ।

৩. আমরা ভালো আছি:

জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার একটি সহজ অজুহাত হচ্ছে, আমরা ভালো আছি। মূলত আমরা কল্পনা বিলাসিতার চূড়ান্ত এক পর্ব অতিক্রম করছি। বলা হচ্ছে, নামায, রোযা করতে কোন বাঁধা নেই, জিহাদের কী প্রয়োজন? বিচার ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলবে -একথা বলার এক বিন্দু অধিকার যে আমাদের নেই তা আমরা ভেবে দেখিনি।

মুসলমানদেরকে যারা প্রতিনিয়ত নিধন করে চলছে তাদের কাছেও আমরা ভাল আছি, কারণ তারা আমাদের ইফতার মাহফিলে যোগদান করে। আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলে। ইসলামকে যারা সেকেলে অচল ধর্ম বলে, তাদের কাছেও আমরা ভালো আছি। কারণ তারা আদর করে আমাদেরকে দাওয়াত খাওয়ায়। যারা বলে ধর্ম যার যার দেশ বা উৎসব সবার, তাদের কাছেও আমরা ভালো আছি। মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র হাতে নিলেও যারা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে, আমরা তাদের কাছেও ভালো আছি। কারণ তারা আমাদেরকে শান্তিকামী উপাধিতে ভূষিত করছে।

একই মুখে শোনা যায়, আমরা ভাল আছি তাই জিহাদের প্রয়োজন নেই। আবার শোনা যায়, আমরা এত ভয়াবহ অবস্থায় আছি যে জিহাদ করা

সম্ভব নয়। আসলে জিহাদকে এড়িয়ে চলতে হবে, শব্দ যাই হোক। যখন যা বলে বাঁচা যায়, বাঁচা দরকার। শত্রুর শতভাগ নিয়ন্ত্রণে থেকে 'ভালো আছি' ফাতাওয়া দিয়েছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আর আহমদ রেজা খান বেরেলভী। আকাবিরে দেওবন্দ তাদের মোকাবেলা করে গেছেন।

আর আমরা জিহাদের প্রশ্নে কাদিয়ানী ও বেরেলভীর শতভাগ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। পারলে আরো দু'কদম এগিয়ে আছি। কাদিয়ানী-বেরেলভী বৃটিশ শাসিত হিন্দুস্তানকে দারুল ইসলাম ঘোষণা দিয়ে খ্রিস্টান প্রভুদের কৃপা লাভ করেছে। আর দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত কেউ কেউ ইহুদী-খ্রিস্টান শাসিত সারা বিশ্বকে দারুল ইসলাম, দারুল আমান তথা শান্তিময় পৃথিবী হিসাবে প্রমাণ করার জন্য মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে ফতোওয়া তৈরি করে ইহুদী-খ্রিস্টানদের কৃপা লাভ করার সর্বোচ্চ অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সে ফাতাওয়ায় বিশ্বের কোন জিহাদী কাফেলাকে বাদ রাখা হয়নি। শর্তসাপেক্ষ কোন জিহাদী কর্মকাণ্ডকে স্বীকার করা হয়নি এবং এর কোন সম্ভাব্যতা দেখানো হয়নি। যার অনিবার্য ফলাফল জিহাদকে অস্বীকার করা।

এখন দেওবন্দের বিপক্ষ শক্তি যদি বলে, এ তিন ফতোয়ার পরস্পরে ব্যবধান কী? এবং দায়দায়িত্ব যদি দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আহলে দেওবন্দ এ দায়িত্ব কেন মাথায় নেবে? এর জবাব দেওবন্দীরা কেন দেবে? এটা ব্যক্তিবিশেষের হীন স্বার্থ চরিতার্থ।

নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে কিনআন ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সে দায়িত্ব যদি নূহ আলাইহিস সালামের উপর না আসে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বাবা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে যদি সে দায়িত্ব ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর না আসে তা হলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ জিহাদ ও মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সে দায়িত্ব দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের কাঁধে কেন আসবে?!

৪. বড় জিহাদের অনুশীলনঃ

জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার সহজ কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে জেহাদে আকবর বা বড় জিহাদকে। এ শিরোনামে আমরা কত পর্বে ধোঁকা খাচ্ছি এবং ধোঁকা দিচ্ছি!

প্রথমত জিহাদ আর বড় জিহাদ এক বিষয় নয়। দু'টি আলাদা দু'টি আমল। মনের সঙ্গে জিহাদ একটি ভিন্ন আমল, আর কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ একটি ভিন্ন আমল। এক আমল দ্বারা কখনো অপর আমল থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না। এমনিভাবে একটি আমলে পূর্ণতা লাভ করার পর অপর আমল ফরয হবে -বিষয়টি এমনও নয়।

এ কথাগুলো দলিল দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এছাড়া বড় আব্বা যেমন আব্বা নয়, বড় আম্মা যেমন আম্মা নয়, তেমনিভাবে বড় জিহাদও জিহাদ নয়। জিহাদ ভিন্ন আমল, আর বড় জিহাদ ভিন্ন আমল। ইসলামের সোনালী পর্বগুলোতে জিহাদকে বড় জিহাদের উপর মওকূফ রাখা হয়েছে এমন কোন নযির নেই। যে অঙ্গন ইলমে সমৃদ্ধ অন্তত সে অঙ্গনের ব্যক্তিদের মুখে এ কথাগুলো মানায় না। এ পর্যায়ে আমরা একবার ধোঁকা খাই।

দ্বিতীয়তঃ যে হাদীসের আলোকে নফসের জিহাদকে বড় জিহাদ এবং কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে ছোট জিহাদ বলা হচ্ছে, সে হাদীসটি বর্ণনাসূত্রের বিচারে এমন পর্যায়ের নয় যা জিহাদের শত শত আয়াত ও হাদীসের বিপরীতে দলিল হতে পারে। উপরন্তু হাদীসটিকে কেউ কেউ জালও বলেছেন। এ পর্যায়েও আমরা আবার ধোঁকা খাই।

তৃতীয়তঃ জিহাদের ময়দান যেখানে নিজের জীবনের সবকিছু অর্থাৎ জান, মাল, স্ত্রী, সন্তান, মান, সম্মান, স্বার্থ সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে শুধু আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য পা ফেলা হচ্ছে, সেখানে নফসের জিহাদ পাওয়া যায়নি, নফসের জিহাদ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে জান, মাল, সম্পদ, সম্মান কোন কিছু ক্ষয় যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। এ পর্যায়ে এসে আমরা আবারও ধোঁকা খাই।

দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের যে কাফেলার পরিচয়ে আমরা পরিচিত, যে বীর সেনানীদের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত তাঁরা কি কখনো মনে করতেন যে, জিহাদের ময়দানের বাইরে কোথাও নফসের সঙ্গে জিহাদ হতে পারে? এবং নফসের জিহাদের মাধ্যমে ময়দানের জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়? এ ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ধোঁকা খাচ্ছি, নয়তো ধোঁকা দিচ্ছি। এরই মাধ্যমে দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দকে কালিমাযুক্ত করছি।

চতুর্থত: নফসের জিহাদের জন্য একটি ক্ষুদ্র সীমিত ছক তৈরি করে দেয়া হয়েছে যা পূরণ করার সাথে সাথে নফসের জিহাদও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সাথে সাথে ময়দানের জিহাদও আদায় হয়ে যাচ্ছে। সে নির্দিষ্ট ছকের বাইরে দ্বীনের আর কোন অঙ্গনে নফসের এ জিহাদের কোন অস্তিত্ব নেই, বা আছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কেউ স্বীকার করতে রাজি নয়।

পঞ্চমত: নফসের জিহাদ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার এমন কোন পর্ব নির্বাচন করার কোন সুযোগ নেই, যেখানে গিয়ে বলা যাবে এখন ময়দানের জিহাদে নামা যেতে পারে। বিষয়টি এতই বায়বীয় যে, এ ছকের অধীনে কেয়ামত পর্যন্ত কখনো জিহাদের ময়দানে নামার সুযোগ আসবে এমনটি আশা করা যায় না। অতীতে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। এ পর্যায়েও আমরা নফসের জিহাদ পূর্ণ হওয়ার আশায় বসে আছি আর ধোঁকা খাচ্ছি। জিহাদের ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার গুনাহে লিপ্ত আছি। জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে পেরেছি এ খুশিতে পরিতৃপ্ত আছি।

অথচ বড় জিহাদ ও নফসের জিহাদের ব্যাপারে আমাদের আকাবির ওলামায়ে কেরামের মনোভাব কী ছিল? আকাবিরের নামে তো আমরা বহু মিথ্যা কথা প্রচার করে থাকি যা কখনো শত্রুর মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার চাইতেও বেশি হয়ে যায়। মুফতী রফী ওসমানী দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন-

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর বাণী:

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. (মুফতী আযম পাকিস্তান) বলতেন- জনৈক ব্যক্তি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.কে জিজ্ঞাসা করে যে, সূফী দরবেশরা অনেক বৎসর পর্যন্ত তাদের মুরীদদেরকে যে ধরনের মুজাহাদা এবং সাধনা করান,

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর সাহাবীদের দ্বারা এমন মুজাহাদা করাতেন না। তা হলে সুফিয়ায়েকেরাম তা কেন করান?
হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. উত্তরে বললেন- হুবহু শব্দ তো মনে নেই, তার ভাবার্থ তুলে ধরছি। [রফি উসমানী- লেখক]

আসল কথা এই যে, তরীকতের মধ্যে মুজাহাদা এবং সাধনা মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য- আত্মার সংশোধন। যার উদ্দেশ্য হল- আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সঠিক ও সুদৃঢ় করা এবং নফসকে শরীয়তের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নফসের চিকিৎসারূপে এ সমস্ত মুজাহাদা করানো হয়, যেন নফস কষ্ট করতে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরূপ অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার জন্য শরীয়তের অনুশীলন সহজ হয়ে যায়। তখন শরীয়তের উপর আমল করতে শুধুমাত্র পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন পড়ে। আর মুরশিদ এ কাজটিই সম্পাদন করে থাকেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে শুধুমাত্র জিহাদ দ্বারাই সাহাবায়ে কেরামের এ উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণে হাসিল হত যে, তাদের অন্য কোন মুজাহাদা বা সাধনার প্রয়োজন ছিল না। তারা একটি মাত্র জিহাদ দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার এমন উচ্চমার্গসমূহ অতিক্রম করতেন, যা অন্যদের বছর বছর মুজাহাদা করার দ্বারাও অর্জিত হয় না।

এখনো যে সব লোক কামিল মুরশিদের তত্ত্বাবধানে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকে, তাদের অধিক মুজাহাদার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, জিহাদ নিজেই একটি মুজাহাদা, যা আধ্যাত্মিক ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভ এবং তাআল্লুক মাআল্লাহর জন্য অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র"। [আল্লাহর পথের মুজাহিদ, মুফতী রফী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম পৃঃ ১৮২-১৮৩]

দেখুন শায়খুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহ আমাদের হাদীসের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি, ফিকহের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি, জিহাদের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি, তাসাওউফের ক্ষেত্রে পূর্বসূরি। আর এ ঘটনার বর্ণনাসূত্র সন্দেহাতীত। কিন্তু আজ আমরা আকাবিরের নামে মিথ্যা প্রচার করে নফসের জিহাদের কারণে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করতে পারছি না।

এক গুরুত্বপূর্ণ মাদরাসার গুরুত্বপূর্ণ উস্তাদ জিহাদের হাদীসের উপর সারগর্ভ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, নফসের জিহাদ যদি জিহাদ না হয়ে অস্ত্রের জিহাদই জিহাদ হয় তা হলেতো আবু জাহাল আবু লাহাবও মুজাহিদ হত!! ভদ্রলোক কি বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। তিনি কি মনে করেন, আল্লাহর পথের মুজাহিদগণ জিহাদের জন্য মুমিন হওয়া জরুরী মনে করেন না?!

৫. জিহাদের দাওয়াতী পদ্ধতি:

দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজন্মের একটি অংশ জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে নিজের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, জিহাদ একটি ফরয আমল সব সময়ের আমল। তবে এর كيفية বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট নয়। সব সময় এক রকম নয়। বর্তমানে জিহাদের পদ্ধতি হচ্ছে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত পদ্ধতি।

বলাবাহুল্য, জিহাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যার সঙ্গে আকাবিরে দেওবন্দের আকীদা বিশ্বাসের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা শায়খ ইলয়াস রহ. এবং তাঁর পরবর্তী মুরুব্বিয়ানে কেরামের ফিকরের সঙ্গেও এর কোন দূরতম সম্পর্ক নেই।

জিহাদ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আমল, দাওয়াত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আমল। দাওয়াতী পদ্ধতিতে কেন জিহাদকে বাস্তবায়ন করতে হবে? দাওয়াতের কাজের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে না আয়াতের অভাব আর না হাদীসের অভাব আছে। এরপরও জিহাদের আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে কেন দাওয়াতের কাজকে প্রমাণ করতে হচ্ছে? বিষয়টি বোধগম্য নয়।

একজন কৌতূহলীর মনে এ কথা জাগতেই পারে যে, হয়তো এর দ্বারা দাওয়াতের কাজ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদকে অস্বীকার করা। জিহাদের স্পৃহাকে সমূলে শেষ করে দেয়া এবং বিশাল জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে দেয়া। কেউ যদি এমনটি ভেবে বসে তা হলে এর সঠিক কোন উত্তর নেই। তবে এর জন্য কখনো দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দকে দায়ী করা যাবে না।

এর দ্বারা জিহাদকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য -এ সন্দেহ আরো দৃঢ়মূল হয় যখন দেখা যায়, জিহাদের প্রত্যেকটি পরিভাষা, প্রতিটি ফযিলত, প্রতিটি পদ্ধতিকে দাওয়াতের কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও আবার দাওয়াতের যে কোন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নয়; বরং প্রচলিত শুধুমাত্র একটি বিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে।

আর শুধু যে জিহাদের কথাগুলো দাওয়াতের একটি বিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নয়; বরং এটাকেই আসল প্রয়োগ ক্ষেত্র বলা হচ্ছে এবং মূল জিহাদকে স্পষ্ট শব্দে অস্বীকার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে জিহাদের প্রসঙ্গটি উত্থাপনই করা যায় না। অথচ দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত ধারার প্রতিষ্ঠাতা ও মুরুব্বিয়ানে কেরামের মানসিকতার সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

এর দ্বারা জিহাদকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য -এ সন্দেহ করতে আরো বেশি ইচ্ছা করে যখন দেখা যায়, দাওয়াতের কাজের বিশেষ কোন যিম্মাদারের ব্যাপারে দাবি করা হয় যে, তিনি বর্তমান যামানার আমীরুল মুমিনীন, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং যে তার আনুগত্য মেনে নেবে না তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। সন্দেহ আরো বেড়ে যায় যখন দেখা যায়, জিহাদের প্রত্যেকটি ঘটনাকে তাবলীগের কাজের উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয়।

৬. জিহাদের গণতান্ত্রিক বাস্তবায়নঃ

জিহাদের ফরয দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার একটি অভিনব পদ্ধতি হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলনকে জিহাদ নামে ভূষিত করে এর সঙ্গে গা লাগিয়ে রাখা। কুফরী আইনের আঁকা ছক অনুযায়ী নির্দিষ্ট কয়েকটি গলিতে প্রদক্ষিণ, কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণ এবং কুফরী আইনের গায়ে আঁচড় না লাগে মত কিছু বক্তব্যের সমষ্টিকে জিহাদ নাম দিয়ে জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় করে ফেলার তৃপ্তিতে আমরা পরিতৃপ্ত হচ্ছি। প্রজন্মের একটি অংশ জিহাদের এ চেহারাই জনগণের সামনে তুলে ধরেছে।

কাফেরদের আবিষ্কার করা কুফরী গণতন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে ইসলামী হুকুমত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?! আমাদের ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ কেন তা গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলনকে জিহাদ নাম দেয়ার মাধ্যমে আমরা জিহাদের ফরয দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার আরেকটি সহজ কৌশল পেয়েছি।

এরই সুফল (?) হিসাবে এসব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের এ কাজকে জিহাদ বলে, নিজেদেরকে মুজাহিদ ভেবে এবং তাদের নেতাকে আমীরুল মুজাহিদীন আখ্যা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করছে এবং ময়দানে যারা জিহাদ করছে তাদেরকে সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করছে না।

দেখুন, 'জ্যালিম সরকারের সামনে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ' এটা হাদীসের ভাষ্য। কিন্তু এর বাস্তবায়নটা আমরা কীভাবে করছি। প্রথমত আমরা জালেম সরকার ও কাফের সরকারের ব্যবধান ভুলে গেছি। দ্বিতীয়ত হক কথার ঐ অংশটুকু বলছি যা কুফরী সংবিধানের পরিপন্থী নয়। দেখা যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা এগুচ্ছেন তাঁরা যত হক কথাই বলেন না কেন সব সময় কুফরী সংবিধানকে সম্মান করেই কথা বলেন।

এখন যারা পৃথিবী থেকে কুফরী সংবিধান বিলুপ্তির জন্য জিহাদের ময়দানে নিজেকে কুরবান করে দিচ্ছেন তারা যখন দেখেন, দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা কুফরী শক্তির সকল আইন কানুন মেনে নিয়েও নিজেদেরকে মুজাহিদ পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি বোধ করছে, তখন তারা গোটা দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দকে জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী বলতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। অথচ আকাবিরে দেওবন্দের জিহাদী আন্দোলন ও ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?!

এছাড়া জালিম সরকারের সামনে হক কথা বলা একটি আমল, ময়দানে জিহাদ করা আরেকটি আমল। শুধু হক কথা বলার দ্বারা কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ফরয দায়িত্ব কীভাবে আদায় হয়ে যাবে?

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দ যে জিহাদী চেতনা বুকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যুগের আবর্তনে বিবর্তনে তার উপর বহু স্তর বালু পড়ে সে চেতনা মানসপট থেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। সে জিহাদী চেতনা এমনভাবে বিলুপ্ত হয়েছে যে, এটি যে শরীয়তের একটি অংশ, একটি ফরয

বিধান, সর্বকালের চলমান একটি বিধান তা একজন আহলে ইলম দ্বীনদার ব্যক্তিকেও বোঝাতে ঘর্মাক্ত হয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ শরীয়তের একটি বিধানকে এভাবে ভুলে যাওয়াও কবিরা গুনাহ। ঈমান পরিপন্থী কাজ।

ভয়ংকর বাস্তবতার মুখোমুখী:

দারুল উলূম দেওবন্দের লড়াকু পূর্বসূরিদের কাপুরুষ উত্তরসূরিরা এতটাই ঝুঁকিমুক্ত দ্বীনদারীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের এ কাপুরুষতাকে ভিত্তিবহুল করার জন্য যিনি যে বিভাগে রয়েছেন তিনিই সে বিভাগকে জিহাদের বিভাগ হিসাবে প্রমাণিত করে মূল জিহাদের বিভাগকে দলিলশূণ্য করে দিয়েছেন। জিহাদের বিভাগটি হয়ে গেছে লা-ওয়ারিশ। এ জন্য জিহাদের এ সম্পত্তি নিয়ে সবার কাড়াকাড়ি। জিহাদের ফযিলত, জিহাদের দলিল অন্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অধিকার আছে, অনুমতি আছে। শুধুমাত্র জিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অধিকার নেই, অনুমতি নেই।

আমরা এমন এক কঠিন ও কষ্টকর সময় অতিক্রম করছি:

জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে দাওয়াতের ফযিলত ও হুকুম প্রমাণ করতে কোন অপরাধ নেই, জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে তাসাওউফের ফযিলত ও হুকুম প্রমাণ করতে কোন অপরাধ নেই, জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ফযিলত ও হুকুম প্রমাণ করতে কোন অপরাধ নেই, জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে চাঁদার ফযিলত বয়ান করতে কোন অপরাধ নেই, জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দিতে কোন অপরাধ নেই। অপরাধ হচ্ছে, জিহাদের আয়াত-হাদীস দিয়ে জিহাদের হুকুম ও ফযিলত বয়ান করা। আমেরিকা, লন্ডন, ফ্রান্সের দৃষ্টিতেও অপরাধ, ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টিতেও অপরাধ, এমনকি মুবাল্লিগ, সূফী ও রাজনীতিবিদের দৃষ্টিতেও অপরাধ। وإلى الله المشتكى ।

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং আকাবিরে দেওবন্দের জিহাদী চেতনার বিলুপ্তির মাত্রা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজন্মের কোন কোন সদস্য কাফেরদের ঘেরা কুফরের সংসদে দাঁড়িয়ে সদম্ভে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছেন, 'আফগানিস্তানের জিহাদী কাফেলার একটি সদস্যও দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়'। এ

ঘোষণা দিয়ে কাফেরদের হাত তালিতে তিনি ধন্যও হয়েছেন, বাহ! বাহ! -এর শ্রুতিমধুর ধ্বনিতে সিক্তও হয়েছেন।

এ দৃশ্য দেখে যদি কেউ মন্তব্য করে, দারুল উলূম দেওবন্দ একটি জিহাদ বিরোধী শক্তি, তাহলে তার এ অভিযোগের সামনে আমরা নিতান্তই অসহায়। কিন্তু একটু ইনসাফ করে বলুন, আকাবিরে দেওবন্দ কি গর্ব করার জন্য এ উপাদানগুলোই আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছিলেন? কেন আজ আমরা এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দকে বদনাম করছি এবং শত্রুপক্ষকে বদনাম করার সুযোগ করে দিচ্ছি।

সত্য ঢেকে রাখা যায়নি:

দারুল উলূম দেওবন্দের বর্তমান আকাবিরদের একজনকে যে লক্ষ লক্ষ জনতার মাহফিলে দাওয়াত করা হয়েছে সে মাহফিলের আয়োজকের বক্তব্য হচ্ছে-

গণতন্ত্রের কুফরী আইনের অধীনে যে নির্বাচন তারা করেন সেটা জিহাদ, এছাড়া আর যা করা হচ্ছে তা কোন জিহাদ নয়। এ নির্বাচনে যারা অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে অংশ গ্রহণ করবে সে হচ্ছে মুজাহিদ। এমন মুজাহিদ যে নামায, রোযাসহ সকল ইবাদতের সাওয়াব পাবে। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমানদের সামনে এ কথার প্রচার করা হচ্ছে। এ জিহাদ করার কারণে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেছে সে কথা কঠিনভাবে প্রচার করা হচ্ছে।

জিহাদের এ চিত্র আমার জানা মতে মওদূদীপন্থী জামায়াত-শিবিরের আঁকা। এর সঙ্গে কুরআন, হাদীস, সীরাত, ফিকহের কী সম্পর্ক? নির্বাচন কত যুগ আগের আবিষ্কার? কাদের আবিষ্কার? কী উদ্দেশ্যে আবিষ্কার? আমরা সবাই এ সম্পর্কে কম-বেশ জানি। এর পরও নির্দ্বিধায় কথা বলে চলছি।

শরীয়তের স্বীকৃত ও পরিচিত বিধানকে শুধু শাব্দিক অর্থের অজুহাতে অন্যত্র ব্যবহার করা মুলহিদদের কাজ। 'সালাত' শব্দের শাব্দিক অর্থের সুযোগ নিয়ে যদি কোন অপদার্থ ড্যান্স দেয়াকে কুরআন-হাদীসের হুকুম বলে প্রচার করে তা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা হবে?

শত্রু বেশি শক্তিশালী এ দলিল দিয়ে যদি কেউ জিহাদ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তা হলে তার হুকুম কী? কেউ যদি আমেরিকাকে হাজের-নাজের মনে করে, কাদেরে মুতলাক মনে করে বা আলিমুল গায়ব মনে করে তা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে কী বলা হবে? -এসব বিষয়ে ভাবার মত সময় এসে গেছে। গড়িমসি করা আর চলে না। বিশেষত যখন দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের পরিচয় দিয়ে তা করা হবে তখন দেওবন্দের প্রত্যেকটি সন্তানের দায়িত্ব হয়ে যায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলা।

মোটকথা দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের উপর জিহাদী চেতনার বিস্মৃতির অভিযোগ এসেছে। দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ এ অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ অভিযোগে অভিযুক্ত প্রজন্ম, প্রজন্মের একটি অংশ, প্রজন্মের বিচ্যুত কিছু সদস্য। এ জন্য গোটা দেওবন্দ দায়ী নয়।

অভিযোগ- ৪ঃ স্বাধীন চেতনার বিলুপ্তি

অভিযোগ করা হয়েছে, দেওবন্দ ও ওলামায়ে দেওবন্দ স্বাধীন চেতনার অধিকারী নন। তারা গোলামী ও দাসত্বের মানসিকতা লালন করেন।

জবাবঃ

এ অভিযোগটি শতভাগ মিথ্যা। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে একটি স্বাধীন মানসিকতা। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, ব্যক্তিগত আধিপত্যই নয় বরং সরকারী আধিপত্য মেনে নিতেও ওলামায়ে দেওবন্দ কখনো রাজি ছিলেন না। সরকারের আজ্ঞা মেনে চলতে হবে সে কারণে ওলামায়ে দেওবন্দ মাদরাসাকে সরকারের হাতে ন্যস্ত করেননি। সরকারের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে হবে তাই সরকারী মঞ্জুরী তাঁরা গ্রহণ করেননি। সরকারী আইন মেনে চলতে হবে তাই সরকারী নীতির সঙ্গে তারা ওয়াদাবদ্ধ হননি।

দ্বীনের ও দ্বীনী ইলমের সকল চাহিদা পূরণ করার জন্য, সকল ধ্যান- ধারণা ও মানসিকতাকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি মাকতাবায়ে ফিকরের বা সভ্যতা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বিভাগ যতটা স্বাধীন থাকা দরকার ততটা

স্বাধীনতা নিয়েই দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন পক্ষের, কোন শক্তির রক্তচক্ষুর ভয়ে আপন সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়নি, সিদ্ধান্তে শিথিলতা আনতে হয়নি।

বৃটিশ শাসিত ভারতে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম দেওবন্দ থেকেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এবং বেগবান হয়েছে। হিন্দুত্ববাদের শাসন ঘেরা হিন্দুস্তানের দারুল উলূম দেওবন্দ থেকেই ইসলামের দাওয়াতের প্রসার ঘটেছে। বদদ্বীন ও বেদ্বীনের সর্বোচ্চ তুফানের মাঝেই দাওয়াত ও তাবলীগের মহান কাজের সূচনা হয়েছে এবং প্রসার লাভ করেছে। খ্রিস্টানদের দাপটের মাঝেই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে দারুল উলূম দেওবন্দ নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছে এবং প্রতিষ্ঠা করেছে। বিদআতের অপ্রতিরোধ্য জোয়ারের মাঝে আহলে দেওবন্দ প্রতিরোধের পাহাড় তৈরি করেছেন। সাধারণ শিক্ষাদানের চতুর্মুখী আহ্বানের মাঝেও একমাত্র দ্বীনের জন্য দ্বীনী শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরার হিম্মত একমাত্র দারুল উলূম দেওবন্দই দেখিয়েছে।

মোটকথা, দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দ এতটাই স্বাধীন মানসিকতার অধিকারী ছিলেন যে, কোন পরিবেশ পরিস্থিতি, কারো দাপট ও হুংকার তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাদের গতিরোধ করার তো প্রশ্নই আসে না গতিকে ভিন্নমুখীও করতে পারেনি। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে বহু কষ্টকর পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েও নীতিকে তারা বিসর্জন দেননি।

বহিরাগত শক্তির বিন্দুমাত্র প্রভাব দারুল উলূম দেওবন্দের আঙ্গিনায় বা আহলে দেওবন্দের মনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। যে সকল ছিদ্রপথে এমন অঘটন ঘটতে পারে সে সকল ছিদ্র বন্ধ করে তাঁরা কাজ শুরু করেছেন। এমন জঘন্য বৈরী পরিবেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান এবং একটি সভ্যতা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাই এর প্রমাণ বহন করে।

তাই দেওবন্দ ও ওলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই যে, তাঁরা স্বাধীন মানসিকতা পোষণ করেন না। দারুল উলূম দেওবন্দ হচ্ছে স্বাধীন দ্বীন চর্চার পদ্ধতির প্রবর্তক। সব বাধা-

বিপত্তিকে উপেক্ষা করে দ্বীনকে দ্বীনের দাবি ও চাহিদা অনুযায়ী চর্চা করা ও বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি শিখিয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দ।

আত্মকথাঃ

তবে হ্যাঁ! আমরা যারা দারুল উলূম দেওবন্দ ও আকাবিরে দেওবন্দের অযোগ্য উত্তরসূরি, আমাদের কারো কারো কোন কোন আচরণে আকাবিরে দেওবন্দের উপরও এ অভিযোগ আসতে পারে, যদিও তাঁরা এ থেকে শতভাগ মুক্ত। দারুল উলূম দেওবন্দের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের পরস্পরের ব্যবধানের চিত্র হচ্ছে নিম্নরূপ-

ক্ষমতাসীনের পক্ষ থেকে সমাবেশের বিরুদ্ধে কারফিউ জারি করা হয়েছে। প্রধান বক্তা ও তার ঘোষকের বুকে গুলি চালানোর হুকুম দেয়া হয়েছে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে প্রধান বক্তা শায়খুল আরব ওয়াল আজম শাইখুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে খোলা বুক ফুলিয়ে প্রধান বক্তার নাম নিজেই ঘোষণা করে বক্তব্য দেয়া শুরু করে শাসক গোষ্ঠীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। আগুন ভরা সে বুকে গুলি চালানোর হিম্মত শাসকগোষ্ঠী করতে পারেনি। **-এ হচ্ছে পূর্বসূরি।**

আর নাস্তিকদের সমাবেশে, নষ্ট নারী-পুরুষদের বেষ্টনীতে দাঁড়িয়ে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন সেসব ব্যক্তিদের সঙ্গে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, তাঁর অনুসারীদেরকে ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট শব্দে গালমন্দ করেছে। শাসক গোষ্ঠীর কোন চাপ ছিল না, শুধুমাত্র ধারণা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা শাসক গোষ্ঠী খুশি হবে। কুফরী শক্তির কৃপা পাওয়া যাবে। **-এ হচ্ছে উত্তরসূরি।**

উত্তরসূরিদের কোন অংশ এবং প্রজন্মের কোন সদস্য যদি তার স্বাধীন চেতনাকে এভাবে বিকিয়ে দেয়, চাই তা ভয়ে হোক, লোভে হোক, বা জিদে হোক সর্বাবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দ এর জন্য দায়ী নয়। এসব বিষয়কে এবং এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পুঁজি করে দারুল উলূম দেওবন্দকে, দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরকে এবং দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তা-চেতনাকে যদি কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় তাহলে এটা অন্যায়, সীমালঙ্ঘন।

আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দ তো রাষ্ট্রীয় ও কুফরী হুমকীকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছেন, কিন্তু উত্তরসূরির একটি বিচ্যুত অংশ কুফরী শক্তির প্রভাবকে গলার মালা হিসাবে জড়িয়ে নিয়েছে।

বনী ইসরাঈলের কথা মনে পড়েঃ

প্রজন্মের কোন কোন অংশ দাসত্বের মালা এমনভাবে গলায় জড়িয়েছে যে, কোন মুক্তিকামী যদি তাদেরকে মুক্তির পথ দেখায় তাহলে তারা তাকে শত্রু মনে করে।

মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতের কথা সবারই স্মরণ থাকার কথা। দাসত্ব ও গোলামীর এত দীর্ঘ মেয়াদ তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে যে, দাসত্বের বাইরে তাদের আর কোন জীবন হতে পারে এটা তারা কল্পনাও করতে পারত না। তারা বুঝেই নিয়েছিল যে, সৃষ্টিগতভাবে মানুষ দুই প্রকার। কেউ মনিব আর কেউ গোলাম। মনিব কখনো গোলাম হবে না, আর গোলাম কখনো মনিব হবে না।

বনী ইসরাঈল নিজেদের ব্যাপারে এ বিশ্বাসই পোষণ করত যে, তারা কখনো মনিব হবে না। গোলামীর জীবনই তাদের কাছে অমৃতের মত মনে হত। যেমন হাঁস- মুরগী, গরু, ছাগল তার মনিবের খড়-ভুসি খেয়ে পরম তৃপ্তিতে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করে চলছে, তেমনি বনী ইসরাইল তাদের জীবনের সে তৃপ্তিটাই ভোগ করার জন্য নিজেদেরকে শতভাগ প্রস্তুত করে নিয়েছিল।

মুক্তিকামীর অসহায়ত্বঃ

তাদের মুক্তিকামী মূসা আলাইহিস সালাম এসে যখন তাদেরকে মুক্ত করতে চাইলেন, স্বাধীনতার সুখ দিতে চাইলেন তখন বনী ইসরাঈল তা ভালভাবে নেয়নি। তারা মূসা আলাইহিস সালামকে বলে ফেলেছে, তুমি আসার আগেও আমরা কষ্টে ছিলাম, তুমি আসার পরেও আমরা কষ্টে আছি। তারা গোলামী জীবনে গোলামীর কষ্ট আর স্বাধীন জীবনে রাজত্বের কষ্টের মাঝে প্রভেদ করতে পারেনি। ফলে তাদের মুক্তিকামীকে তারা শত্রু মনে করেছে। তার কার্যক্রমকে শত্রুতা মনে করেছে।

এ ইতিহাস আমরা জানি। তবে শুধু ইতিহাস হিসাবে জানি। কিন্তু ইতিহাসের মাঝে যে বর্তমানের নির্মাণ নিহীত তা আমরা ভেবে দেখিনি।

আকাবিরে দেওবন্দ, যাঁদের ভাষা ছিল پادشاہی کردہ بودم پاسبانی کے کنم (যে আমি বাদশাহ ছিলাম এখন দারোয়ান হব কীভাবে?) সে আহলে দেওবন্দের উত্তরসূরিরা আজ নিজেদের সকল ইচ্ছা, নিজেদের সকল স্বপ্ন, দ্বীনের সকল চাহিদা, ইলমে দ্বীনের সকল দাবি ও আহকামকে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের শত্রুদের ইচ্ছার পদতলে ন্যস্ত করে দিয়েছে।

এমন এমন দৃশ্যও আজ আমরা দেখতে বাধ্য হচ্ছি যেখানে শরীয়তের বিচারে সকল অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির এক আঙ্গুলের ইশারার সামনে কুরআন, হাদীস ও মুজাতাহিদীনে কেরামের সকল ইস্তেম্বাত ও সকল বিধান ম্লান হয়ে যায়।

আল্লাহর আসনে এরা কারা?

প্রজন্মের কোন কোন স্খলিত অংশ তার দ্বীনী বয়ানের ক্ষেত্রে, লিখনীর ক্ষেত্রে, গান তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং পরস্পর বিতর্কের ক্ষেত্রে পুরো কুরআন তালাশ করে, পুরো হাদীসের ভাণ্ডার তালাশ করে, ইসলামের পুরো ইতিহাস তালাশ করে এমন আলোচ্য বিষয়গুলো উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করে যা কোন নাস্তিকের নাস্তিকতার উপর আঘাত করে না, কোন কাফেরের কুফরের উপর আঘাত করে না, কোন মুশরিকের শিরকের উপর আঘাত করে না, কোন চোরের চুরির উপর আঘাত করে না, কোন ডাকাতের ডাকাতির উপর আঘাত করে না, কোন ঘুষখোরের ঘুষখোরীর উপর আঘাত করে না, কোন সুদখোরের সুদী কারবারের উপর আঘাত করে না, কোন লম্পটের লাম্পট্যের উপর আঘাত করে না, কোন ধোঁকাবাজের চেহারাকে খুলে দেয় না, কোন দালালের দালালীর মুখোশ উন্মোচন করে দেয় না, কোন অসভ্যের অসভ্যতাকে প্রকাশ করে দেয় না, কোন বদমাশের বদমাশীকে আঘাত করে না, কোন ইসলামবিরোধীর বিরোধিতাকে প্রকাশ করে দেয় না।

অথচ এসবই করার কথা ছিল কুরআন, হাদীস, ফিকহের দাবি অনুযায়ী। পরিবেশ পরিস্থিতিতে কুরআন, হাদীস, ফিকহ যখন যা বলতে বলে তখন

তাই বলার কথা ছিল। কিন্তু কুরআন-হাদীসকে সে মাকাম থেকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে আল্লাহর দুশমনদের চাহিদা ও সন্তুষ্টিকে।

কিন্তু এসবই প্রজন্মের অংশ বিশেষের অধঃপতিত দৃশ্য। দেওবন্দ ও আহলে দেওবন্দের চিন্তা চেতনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অভিযোগ উত্থাপনকারীদের সামনে আছে অধঃপতিত ও বিচ্যুত অংশের কার্যক্রম। আর সাধারণত নিন্দুকের দৃষ্টিতে একটি সুন্দর শহরের ময়লা আবর্জনা যেভাবে ধরা পড়ে, তার অট্টালিকা ও বাগান-ঝর্ণা সেভাবে চোখে পড়ে না।

যারা দারুল উলূম দেওবন্দ ও দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরের নিন্দা করতে অভ্যস্ত, শুধুমাত্র তাঁদের দোষ চর্চা করেই তৃপ্তিবোধ করে, তারা শুধু খুঁজে বেড়ায় বিচ্ছিন্ন দল, ব্যক্তি ও ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে, আর এর দ্বারা মহান এ কাফেলাকে ক্লেদাক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যায়।

দারুল উলূম দেওবন্দ স্বাধীন চেতনা নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রজন্মের একটি পর্বে এসে তার বিলুপ্তি ঘটেছে। উত্তরসূরিদের করণীয় হচ্ছে, পূর্বসূরিদের মূল চেতনায় আবার ফিরে আসা। নিজেদেরকে এবং পূর্বসূরিদেরকে নিন্দুকের নিন্দা থেকে রক্ষা করা। সর্বোপরি দ্বীনকে, দ্বীনের কথাকে উঁচু করা।

শরীয়তের প্রয়োগ বদলে গেছে:

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর স্বাধীন চেতনার চিত্র আর তার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজন্মের কিছু অংশের স্বাধীন চেতনার চিত্রকে তুলনা করলেও এর ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে যাবে।

থানভী রহ. মাদরাসার সামনে একটি হাউজ করবেন। এক লোক এসে হাউজ নির্মাণ বাবত কিছু টাকা দিল। থানভী রহ. কি বুঝে টাকাগুলো খরচ না করে একটি থলিতে আলাদা করে বেঁধে রেখে দিয়েছেন। নিজস্ব নকশা অনুযায়ী তিনি হাউজ নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে আলোচ্য দাতা এসে হাজির। লোকটি থানভী রাহিমাহুল্লাহর নকশার বাইরে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে লাগল, থানভী রাহিমাহুল্লাহ নিজের নকশা অনুযায়ী কাজ করতে থাকলেন। অবশেষে লোকটি যখন তার নিজের মতের পক্ষে জোর দিয়ে পরামর্শ দিতে চাইল তখন থানভী আলাইহির রাহমাহ কামরায় গিয়ে

ঐ লোকের দেয়া টাকার থলিটি এনে তার হাতে দিয়ে বললেন, এ নিন আপনার দানকৃত টাকা, এটা নিয়ে যান, হাউজ আমার নকশা অনুযায়ীই হবে। -এ হচ্ছে পূর্বসূরি।

নাস্তিক মুরতাদদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতের আহবানে ওলামা-জনতা রাজপথে। যাকে কমপক্ষে من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه (শরীয়ত বিরোধী কাজ যবান দ্বারা প্রতিহত কর) বলা চলে। কুফরী গণতন্ত্রের আইনেও যা আইনসম্মত। শরীয়তের পক্ষ থেকে তো দায়িত্বই। সে প্রতিবাদীদের উপর শাসক গোষ্ঠীর রক্ষক বাহিনীর নির্বিচারে অবৈধ গুলি চলেছে। প্রতিবাদী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। মুফতিয়ানে কেরাম তাদেরকে শহীদ বলেছেন।

থানভী রাহিমাহুল্লাহর চেতনার অনুসারী হওয়ার দাবিদার। শাসক গোষ্ঠীর দলীয় প্রভাবে ভীতসন্ত্রস্ত বা মদদপুষ্ট কিংবা মর্জির প্রত্যাশী প্রজন্মের একটি অংশ ফাতওয়া দিয়েছে- القاتل والمقتول كلاهما في النار (হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় জাহান্নামে) -এ হচ্ছে উত্তরসূরি।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ প্রতিবাদীর প্রতিবাদে যদি পদ্ধতিগত কোন ভুল থাকে, বা কারো পাতা ফাঁদে পা দিয়ে থাকে, তবুও কি তার ব্যাপারে বলা যাবে القاتل والمقتول كلاهما في النار এ প্রতিবাদী তো প্রতিপক্ষকে মারতে চায়নি, শুধু প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল। প্রতিপক্ষ প্রতিবাদীকে হত্যা করেছে প্রতিবাদী শরীয়তের পক্ষে কথা বলার কারণে। এরপরও কি তার ক্ষেত্রে القاتل والمقتول كلاهما في النار প্রয়োগ করা যাবে?

দুর্ভাগ্যবশত আজ এসব কিছুর দায়িত্বই নিতে হচ্ছে ওলামায়ে দেওবন্দকে। অথচ ওলামায়ে দেওবন্দের স্বাধীন চেতনার সাথে এ কাপুরুষতা ও দাসত্বের মানসিকতার কী সম্পর্ক? আল্লাহ তা'য়ালা নিন্দাকারীদেরকে সঠিক বিবেচনা শক্তি দান করুন।

অভিযোগ- ৫ : পরনির্ভরতার প্রতি আসক্তি

অভিযোগ করা হয়েছে, দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার অনুসারী কওমী মাদরাসাগুলো পরনির্ভর। অন্য শব্দে বলা হয় তারা সমাজের বোঝা। কেউ আবার স্নেহ-আদরের সুরে বলেন, এরা অসহায়। সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুদানে তারা চলে। তাদের চলার নিজস্ব কোন ব্যবস্থা নেই।

জবাব:

এ অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক এবং আগাগোড়া বানোয়াট ও মিথ্যা।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠালগ্নের গোড়ার কথাগুলো বুঝে নিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানটির দু'টি অংশ ছিল। একটি অংশ ছিল এর আয়োজক অংশ, আরেকটি অংশ ছিল এর উস্তায ও তালেবে ইলম অংশ। যেমনিভাবে যে কোন দ্বীনী কাজের ক্ষেত্রেই এভাবে দু'তিন ভাগে দায়িত্ব ভাগ করা থাকে।

দ্বীনের একটি ফরয দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে হলে কারো অর্থ এবং কারো শ্রম ব্যয় করতে হয়। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও যেমন তা কারো অর্থ ও কারো শ্রমের সমন্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এতে কোন পক্ষ কোন পক্ষের উপর অনুগ্রহকারী হয় না; বরং সবাই সহযোগী।

দায়িত্বের বণ্টন:

কেউ যদি জিহাদের জন্য অস্ত্র দান করে, আর একজন মুজাহিদ সে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে তাহলে কখনো বলা যাবে না এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর অনুগ্রহ করেছে। বরং একজনের জান, আরেক জনের মালের কুরবানীর বিনিময়ে দ্বীনের একটি ফরয দায়িত্ব আদায় হয়েছে। যা আদায় না হলে উভয় পক্ষ গুনাহগার হত এবং আদায় হওয়ার কারণে উভয় পক্ষ দায়িত্বমুক্ত হয়েছে।

ইলমে দ্বীনের যে পর্বটি ফরযে আইন তা কখনো টাকার বিনিময়ে অন্যের মাধ্যমে আদায় করা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই সে ফরয দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আর যে পর্বটি ফরযে কেফায়া তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকেই ভাবতে হবে তা কীভাবে আদায় করা যায়। এ

ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে কেউ অর্থ দেবে আর কেউ সময় ও মেধা দেবে। এক্ষেত্রে এ ফরয দায়িত্ব আদায়ের জন্য তাদের কেউ কারো উপর অনুগ্রহকারী নয়। কারণ একথা কখনো বলা যাবে না যে অর্থের চাইতে সময় ও মেধার মূল্য কম।

এ হিসাবেই যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছিল তখন সরকারের পক্ষ থেকে এর নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। আর যখন থেকে অনুপযুক্ত ও অপদার্থ সরকার ক্ষমতায় বসেছে তখন থেকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে এ দায়িত্বগুলো বন্টন করে নিয়েছে। কেউ অর্থের যোগান দিয়েছে, আর কেউ সময় ও মেধার যোগান দিয়েছে। এর সমন্বয়ে ইলম চর্চার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়েছে। সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়েছে, বা দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। কেউ কারো উপর করুণা করেনি। কেউ কারো দাতা নয়। কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহকারী নয়।

এ ধারার আলোকে দারুল উলূম দেওবন্দের আয়োজক পক্ষ অর্থের যোগান দিয়েছে, যোগান দেয়ার সমূহ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আর উস্তায ও তালেবে ইলম পক্ষ সময় ও মেধার যোগান দিয়েছে এবং ত্যাগ দিয়েছে। এভাবেই দারুল উলূম দেওবন্দের সূচনা, পথচলা এবং সফলতা ।

কার্যত এ দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যতটুকু ত্রুটি করবে সে ততটুকুর অপরাধে অপরাধী হবে। এখানে কেউ দাতা গোষ্ঠী নয়, কেউ গ্রহীতা গোষ্ঠী নয়। সবাই সবার দায়িত্ব আদায়ে ব্যস্ত।

নির্ধারিত দায়িত্বে অবহেলার শাস্তিঃ

এখন কেউ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করাকে যদি অনুগ্রহ করা মনে করে তাহলে সে মূর্খ, অজ্ঞ ও অপদার্থ। এমনিভাবে যে সময় ও মেধা ব্যয় করছে সে যদি এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে এবং সময় ও মেধার তুলনায় অনেক কম বিনিময় গ্রহণ করে তাহলে এ বিনিময় নেয়া কখনো পরনির্ভরতা নয়।

কারণ সে যদি তার সময় ও মেধার কিছু অংশকে ইলমের জন্য ব্যবহার না করে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে তার জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যতটুকু সময় ও মেধা এ ব্যক্তি থেকে কম ব্যয়

হবে, ততটুকুই অপর আরেকজনের উপর বর্তাবে। কারণ কাঙ্ক্ষিত অর্পিত দায়িত্ব তো আদায় করতেই হবে, সেটা যার মাধ্যমেই হোক।

দারুল উলূম দেওবন্দ ইলমে দ্বীন শিক্ষার যে ব্যবস্থা চালু করেছে তার মাঝে কোন পরনির্ভরতা নেই; বরং শুধুমাত্র দায়িত্বের বন্টন রয়েছে -এ কথাগুলো আজ আটঘাট বাঁধা প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে বোঝাতে হচ্ছে দু'টি কারণে। **১. প্রত্যেকের দায়িত্ব আদায় না করার উপর লাঠি পেটার ব্যবস্থা নেই। ২. সময় ও মেধার যোগানদাতারা সময় ও মেধাকে ইলমের পেছনে ব্যয় না করে অর্থযোগানদাতার পেছনে ব্যয় করছেন।**

দারুল উলূম দেওবন্দের যে ব্যবস্থা ছিল, তার দাবি হচ্ছে, অর্থ যোগানদাতারা সময় মত নিজ দায়িত্বে অর্থ যোগান না দিলে ফরয দায়িত্ব আদায়ে অবহেলার কারণে তাদের বিচার হওয়া। কিন্তু অবস্থা এখন এতদূর গড়িয়েছে যে, যার উপর যাকাত দেয়া ফরয সে তার যাকাতের আংশিক আদায় করে প্রাপকের হাতে তা তুলে দেয়ার সময় মনে করে সে প্রাপকের উপর করুণা করছে। অথচ সে হচ্ছে দেনাদার। আর প্রাপক হচ্ছে পাওনাদার।

দেনাদার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময় মত দেনা আদায় না করার কারণে এবং পরিপূর্ণভাবে আদায় না করার কারণে লাঠিপেটা খাওয়ার উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আংশিক আদায়ের কোন সুযোগ নেই। যদি বিলম্ব ও অবহেলার জন্য শাস্তির যথাযথ ব্যবস্থা থাকত তাহলে অর্থযোগানদাতারা এ ভুলের শিকার হত না। অর্থযোগানদাতাদের জন্য ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সে লাঠির ব্যবস্থা নেই, ফলে ভুল সংশোধন হয়নি, বরং সময় ও মেধার যোগানদাতাদের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তারা 'পরনির্ভর'।

প্রাপ্য শাস্তি না দেয়ার কুফল:

অর্থযোগানদাতাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে, ইলমের জন্য অর্থ ব্যয়কে তাদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব মনে করে -এ কথাগুলো তাদের ব্যাপারে। আর যারা ইলমে দ্বীনের জন্য অর্থ ব্যয়কে জরুরী মনে করে না, নিজেদের দায়িত্ব মনে করে না, ইলমে দ্বীনের চর্চাকে

ফরয মনে করে না, ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য অর্থ, সময় ও মেধার ব্যয়কে অপচয় মনে করে, তারা আমাদের আলোচনার আওতাভুক্ত নয়। কারণ তারা মুরতাদ, নাস্তিক বা কাফের।

দারুল উলূম দেওবন্দ ইলম চর্চার দায়িত্বকে যেভাবে বন্টন করেছে, সে বন্টন ব্যবস্থার উপরই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত চলার চেষ্টা করছে। কোথাও বিচ্ছিন্ন দুয়েকটি ঘটনা ব্যতিক্রম ঘটলেও বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ঘটলেও এর মূল ধারায় মৌলিক কোন পরিবর্তন আসেনি।

তাছাড়া একটি মেধা নির্ভর কাফেলা কেন একটি মেধাহীন গোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল হবে? এটা কোন যুক্তির কথা হতে পারে না। যারা মেধা ও সময়ের বিনিময়ে জীবন যাপন করবে তারা যদি পরনির্ভর হয়ে থাকে তাহলে শুধুমাত্র কৃষক, শ্রমিক ও জেলেরা ছাড়া আর সবাই পরনির্ভর। কারণ তারা কেউই সরাসরি দু'টি পয়সা উপার্জন করে না, করার যোগ্যতাও রাখে না।

আর যদি কেউ মনে করে দ্বীনী ইলম শিক্ষার বিনিময়ে তো একটি পয়সাও অর্জিত হয় না এবং অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও পাওয়া যায় না, উপার্জনের ক্ষেত্রে তাদের বিন্দু মাত্র অংশগ্রহণ নেই, তাই তাদের জীবন যাপন পরনির্ভর।

এ মানসিকতার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য দু'টি- ১. কৃষক, শ্রমিক ও জেলে ছাড়া এমন কিছু বিভাগ রয়েছে যাদের দ্বারা বিন্দু মাত্র উপার্জন তো হয়ই না এমনকি উপার্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও হয় না। যেমন আইন বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, ওজীরে খামাখা বিভাগ ইত্যাদি আরো বহু বিভাগ। কিন্তু এগুলোকে কেউ পরনির্ভর বলে না। অতএব সরাসরি উপার্জনকারী বা উপার্জনের সহযোগী না হলেই তা পরনির্ভর, বিষয়টি এমন নয়।

২. কেউ যদি মনে করে দ্বীনী ইলম কোন কাজে আসে না, অতএব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পরনির্ভর, তাহলে এ ব্যক্তি হচ্ছে মুরতাদ, নাস্তিক ও কাফের। এর সঙ্গে কাগুজে নসীহত বৃথা। তার জন্য রয়েছে প্রকাশ্যে শিরোচ্ছেদের ব্যবস্থা।

মোটকথা, দারুল উলূম দেওবন্দ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্বটিকে আদায় করার পদ্ধতি সাজিয়েছে এভাবে, কেউ অর্থের যোগান দেবে, আর কেউ সময় ও মেধার যোগান দেবে। এতে করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ফরয দায়িত্বটি সবার থেকে আদায় হয়ে যাবে।

এখন অর্থ যোগানদাতা যদি তার দায়িত্বে অবহেলা করে তখন মেধা ও সময়ের যোগান দাতার দায়িত্ব হবে নিজের ও পরিবারের জীবন যাপনের জন্য যতটুকু সময় ও মেধা ব্যয় না করলেই নয় ততটুকু সময় ও মেধা ব্যয় করে অর্থ উপার্জন করবে, অবশিষ্ট অংশ (যা হিসাবে সময়ের সিংহ ভাগ হবে) ইলমে দ্বীনের জন্য ব্যয় করবে। এতে করে ইলমের ফরয দায়িত্ব আদায়ে অবশ্যই ক্রুটি হবে। কিন্তু এ ক্রুটির জন্য গুনাহগার হবে সামর্থ্যবান অর্থ যোগানদাতা ও অন্যান্য মুসলমানরা, ইলমের জন্য মেধা ও সময় ব্যয়কারী এ আলেম নয়।

আত্মকথা:

অর্থ যোগানদাতারা যখন অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং অপদার্থতা ও দায়িত্ব হীনতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তখন তার সমাধান করতে গিয়ে প্রজন্মের ওলামায়ে কেরাম যে পদ্ধতি বের করেছেন, মূলত সে পদ্ধতির ফাঁদে আটকা পড়ে সমাধান শুধু ভেস্তেই যায়নি, উল্টো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আগুনে সব ছারখার হয়ে গেছে। এ দাবি করতে আমার আজ বিন্দু মাত্র দ্বিধা নেই। চলমান পৃথিবী এবং প্রতিদিনের পৃথিবী এর সাক্ষী।

প্রজন্মের মেধার অধিকারীরা ও মেধার যোগানদাতারা ন্যূনতম জীবন যাপনের জন্য উপার্জনের বৈধ ও সম্মানজনক পদ্ধতিগুলোর পেছনে সময় ব্যয় না করে সে সময়টুকু বা তার চাইতে বেশি সময় ব্যয় করেছেন অর্থ যোগানদাতাদের পেছনে।

এক্ষেত্রে দুটি কারণ দর্শানো হয়েছে, যার বাস্তবতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কারণ দু'টি হচ্ছে, ১. ওলামায়ে কেরাম তথা মেধার যোগানদাতারা অর্থ উপার্জনের পেছনে লেগে গেলে ইলমের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে টান পড়বে। ২. অর্থ উপার্জনের পথে গেলে অর্থের লোভ

পেয়ে বসবে। তাই তাদেরকে সে পথ না দেখিয়ে দেখানো হয়েছে অর্থ যোগানদাতাদের পেছনে সময় ও মেধা ব্যয় করার পথ।

ফলাফল:
কিন্তু আখের ইলমের জন্য বরাদ্দকৃত সময়কে রক্ষা করা যায়নি এবং অর্থের লোভে পড়ে যাওয়া থেকেও বাঁচানো যায়নি। শুধু এতটুকু হয়েছে, সময় ব্যয় হত উপার্জনের পেছনে, এখন হচ্ছে কিছু অপদার্থ মানুষকে তোশামোদের পেছনে, যাদের অধিকাংশ আল্লাহর দুশমন এবং সরাসরি সে দুশমনীতে লিপ্ত। লোভে পড়তো হালাল কামাই করতে গিয়ে, এখন পড়ছে হীনতার চাদর পরে চাঁদা করতে গিয়ে।

তবে এ দাবির উপর কেউ কোন প্রশ্ন উত্থাপনের আগে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে। ১. এখানে উপার্জন অর্থ ন্যূনতম জীবন যাপনের জন্য উপার্জন। আমরা প্রত্যেকে নিজের মত করে প্রয়োজনের যে তালিকা তৈরি করেছি তা উদ্দেশ্য নয়।। ২. আর যারা তোশামোদ করছে এবং লোভে পড়ছে তারাই শুধু উদ্দেশ্য।

এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, যে আশঙ্কাকে সামনে রেখে অর্থ যোগানের প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, সে দু'টি আশঙ্কা থেকে বাঁচা যায়নি। অতএব অর্জনের থলি শূন্য। তবে এ পথে বিসর্জনের তালিকা অনেক দীর্ঘ! অনেক দীর্ঘ! অনেক দীর্ঘ!

বিসর্জনের সে দীর্ঘ তালিকায় প্রবেশের আগে আমাদের দৃশ্যপটে আরেকবার একটু ভাসিয়ে তোলা দরকার যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আকাবিরে দেওবন্দ থেকে শুরু করে সাহাবা-তাবেয়ীন ও রেসালাতের যুগ পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল যাবত ইলমের ধারক বাহকগণ কিভাবে সমস্যার সমাধান দিয়েছিলেন। তাদের দেয়া সে সমাধান ও আমাদের দেয়া সমাধানের মাঝে কতটুকু মিল ও কতটুকু অমিল রয়েছে।

বিসর্জনের তালিকা:
এক. অর্থ যোগানদাতারা অধিকাংশ যেহেতু ইলমে দ্বীন বিষয়ে মূর্খ হয়ে থাকে তাই ওলামায়ে কেরাম তাদের দরবারে হাজির হতে হতে তারা এ

বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে বা তারা মনে করে, দ্বীন ও ইলমে দ্বীন তাদের টাকার মুখাপেক্ষী। তারা দ্বীন ও দ্বীনী ইলমের মুখাপেক্ষী নয়। ফলে তারা কবিরা গুণাহের স্তর থেকে ধীরে ধীরে কুফরীর স্তরে উন্নীত হয়ে চলেছে।

দুই. ওলামায়ে কেরামের, দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের সকল আর্থিক চাহিদা পূরণের একমাত্র ক্ষেত্র যখন থেকে মনে করা হয়েছে অর্থ যোগানদাতাদেরকে, তখন থেকে আল্লাহর ভয়ের সবটুকু অর্থপতিদের দরবারে গিয়ে লুটে পড়েছে। পরিস্থিতি কোন কোন ক্ষেত্রে কবিরা গুনাহ থেকে উন্নীত হয়ে শিরকের পথে উঁকি মারছে।

তিন. যখন থেকে অর্থপতিদের কাছে চাওয়ার পদ্ধতি চালু হয়েছে, তখন থেকে দাতার অর্থ হালাল না হারাম এ প্রশ্ন উদয় হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। নিশ্চিত হারাম জানার পরও প্রত্যাখ্যান করার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

চার. একই ফরয দায়িত্ব আদায়ে মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা হয়ে গেছে করুণার ভিখারী, আর অর্থের যোগানদাতারা হয়ে গেছে করুণার আধার।

পাঁচ. বদর যুদ্ধের তিনশত তের মুজাহিদের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে এমন ব্যক্তিদের নাম যারা বদর যুদ্ধের বৈধতাকে অস্বীকার করে। 'বদরী সদস্য' উপাধিতে ভূষিত হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা জিহাদকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। যারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার মত স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী।

ছয়. মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা চাঁদার থলি নিয়ে যখন বাড়ি বাড়ি ফেরে তখন অর্থের যোগানদাতারা যে কোন ভাষায় তাদের প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে, কিন্তু মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা কোন ভাষায় তার প্রতিবাদ করার অধিকার রাখে না।

সাত. আট, দশ ও বার বছর বয়সের বাচ্চাদেরকে বাড়ির ভেতর পাঠানো হলে তারা প্রাপ্ত টাকার কিছু গোপন করে বাকিটা যিম্মাদারের হাতে দেয়' - এমন খবর আসার পরও কর্তৃপক্ষ শিউরে ওঠে না। একটি কচি শিশুর পবিত্র মনকে খেয়ানতের এমন পথে ঠেলে দিয়েও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত।

আট. শরীয়তের সকল বিধানকে লঙ্ঘন করে অর্থ যোগানদাতার পক্ষ থেকে যে আয়োজন করা হয়েছে সে আয়োজনে অংশ গ্রহণের বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশের কোন অধিকার নেই মেধা ও সময়ের যোগানদাতার।

নয়. মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা প্রকাশ্য সুদী কারবারের কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য দোয়া করতে বাধ্য, মিষ্টির হাদিয়া গ্রহণ করতে বাধ্য, পদোন্নতির পর শুকরিয়া, দোয়া ও মিষ্টির আয়োজন করতেও বাধ্য। বিষয়টা নিয়ে ভাবলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে যাই। বিষয়টি কি আসলে শুধুই কবিরা গুনাহ? না আরো কিছু?!

দশ. অর্থ যোগানদাতারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, দশ কোটি টাকা চুরি করে দশ/বিশ লক্ষ টাকা ইলমের জন্য যোগান দিলে বাকি টাকার কোন জবাব দিতে হবে না। দুনিয়াতেও না আখেরাতেও না।

এগার. কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা যা জানে, অর্থ যোগানদাতার শরীয়ত বিরোধী প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তার বিন্দু মাত্র ব্যবহার করা বা প্রকাশ করার অধিকার রাখে না।

বার. চাঁদা উপলক্ষে সপ্তাহ-দশ দিনের যে বিরতি থাকে, সে বিরতিতে ছাত্ররা যত রকমের ও যত মাত্রায় অপরাধ করার সুযোগ পায় এবং করে, সে পরিমাণ অপরাধ পুরো বছরে করা সম্ভব নয়।

তের. আবুল দাদাদের মত শুধুমাত্র সুপারি ও নারিকেল ব্যবসার যোগ্যতার অধিকারীরা ওলামায়ে কেরামের মজলিসে বলার অধিকার রাখে- 'ইসলাম কি মারামারি করতে বলেছে'? কিন্তু ইলমের জন্য মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা একথা বলার অধিকার রাখে না 'ইসলাম কি করতে বলেছে সেটা আমরা দেখব, এটা আপনার ভাবনার ও বলার বিষয় নয়। এসব বিষয়ে কখনো কথা বলবেন না'।

চৌদ্দ. যুগ যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেখে আসছে, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে চোর, বাটপার, লম্পট ব্যক্তিদের এমনকি ইলমে দ্বীন ও ইসলামের শত্রুদের দ্বারে দ্বারে ফিরতে হয়। যার দরুন দ্বীন ও ইলমে দ্বীন একটি দামি বস্তু তা প্রজন্মকে বোঝানো কঠিন হয়ে যায়। কারণ প্রজন্ম তার

বুঝ হওয়ার পর থেকে দ্বীনকে দুনিয়ার সামনে নতজানু দেখেছে, দুনিয়াকে দ্বীনের সামনে নতজানু দেখেনি। যার ফলে خيركم من تعلم القرآن وعلمه (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয়। এর বাস্তব রূপ দেখার নসীব তার হয়নি।

পনের. অর্থ যোগানদাতারা মনে করে মেধা ও সময়ের যোগানদাতাকে চেয়ার ছেড়ে বসতে দেয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মেধা ও সময়ের যোগানদাতা মনে করে অর্থের যোগানদাতাকে আসন ছেড়ে বসতে দিতে হবে। ফলে প্রজন্ম দামি বস্তু ও ব্যক্তির প্রতিই ধাবিত হয়।

ষোল. দারুল উলূম দেওবন্দের মূলনীতিতে ওলামা-তলাবার পরনির্ভরতার কোন সূত্রই ছিল না। প্রত্যেকে নিজ ফরয আদায়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মূলনীতিতে হেরফের করার ফলাফল এতদূর পৌঁছেছে যে, ওলামা-তলাবা তাদের মেধা ও সময় ব্যয় করেও নিজেদেরকে পরনির্ভর মনে করছে এবং পরনির্ভরতার প্রতি আসক্তিও প্রকট হয়ে উঠেছে।

সতের. অর্থ যোগানদাতারা মনে করতে শুরু করেছে, মাদরাসা-মসজিদে দান করতে হলে হারাম কামাই থেকেই করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনকে তার উপার্জনের হারাম দিকগুলোর তালিকা তুলে ধরলে তিনি নির্দ্বিধায় বলে ফেললেন 'তোমরা এভাবে হারাম বলতে থাকলে তো মাদরাসা-মসজিদ বন্ধ হয়ে যাবে'। আমি বললাম, হারাম কামাই করে মাদরাসা-মসজিদে দান করতে আপনাকে কে বলেছে? এ দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে? দ্বিতীয়ত বলেছি, মাদরাসা-মসজিদ বন্ধ হবে না। সর্বোচ্চ বন্ধ হলে টাইলস, মোজাইক, এসি লাগান বন্ধ হবে, বহুতল ভবন করা বন্ধ হবে। মাদরাসা, মসজিদ বন্ধ হবে না।

আসলে আমরা প্রকৃত প্রয়োজনের গণ্ডিকে অতিক্রম করে জীবনের একটি মান আগেই কল্পনা করে ঠিক করে ফেলেছি। এরপর সে কাল্পনিক মানকে রক্ষা করা জরুরী মনে করেছি। এরপর সে কাল্পনিক জরুরত পুরা করার জন্য হারাম গ্রহণকে বৈধতা দিয়ে দিয়েছি। এসব ক্ষেত্রে আমরা বহুকাল যাবত কুরআন, হাদীস ও মুজতাহিদীনের ইস্তেম্বাতের ধারে কাছেও যাচ্ছি না। সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রতি আহ্বান করা হলে জবাব দেয়া হয়েছে,

মুরব্বিরা কি এগুলো আপনাদের চেয়ে কম বোঝেন? তাঁরা কি না বুঝে না শুনেই করেছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে এ জবাবগুলো বহুকাল যাবত চলছে। আজ যিনি মুরব্বীর উপর ভরসা করে নিজে মাসআলাটি তাহকীক করেননি, তিনিই আগামীকাল মুরব্বী এবং পরবর্তীদের ভরসা। মনে কষ্ট না নিয়ে একটু ভেবে দেখুন, এখনই আপনি যখন আপনার মুরব্বীর উদ্বৃতি দিয়ে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন, তখনও আপনার উদ্বৃতি দিয়ে আপনার বহু ভক্ত-অনুসারীরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অসহায়ত্বের খাঁচায় আবদ্ধ সেসব ব্যক্তি, যারা অনুরোধ করছে, একটু খতিয়ে দেখুন, একটু তলিয়ে দেখুন।

আঠার. জীবনের সবচাইতে দামি সম্পদ মেধা ও সময় ব্যয় করে যে সর্বোচ্চ দামি সম্পদ ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়েছে, তার প্রয়োগক্ষেত্র ইলমের নিয়ন্ত্রণে না এসে অর্থের নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে। দাতারা দোয়া প্রার্থনা করতে গিয়ে এভাবে কথা বলার সাহস পাচ্ছে, বস্ যেভাবে দোয়া করতে বলেন সেভাবে দোয়া করলে তিনি আরো বেশি দান করবেন। উদ্দেশ্য ছিল বিদআতী পদ্ধতির কোন দোয়া। কারণ দোয়াপ্রার্থী ছিলেন একজন বিদআতী।

মেধা ও সময়ের যোগানদাতা ওলামায়ে কেরাম এ কথা বলার সাহস করেননি যে, যেভাবে দোয়া করলে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে সেভাবে দোয়া করব, বা শরীয়তের নির্দেশিত পদ্ধতিতে দোয়া করা হবে। অথবা দ্বীনের যিম্মাদার ইলমের যিম্মাদার তার এমন অশোভনীয় প্রস্তাবের উপর তার গালে একটি চড় বসিয়ে দিতে পারেননি।

উনিশ. অর্থের যোগানদাতারা প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের সংশোধনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

বিশ. ভিক্ষাবৃত্তি ও চাঁদাবৃত্তির মাঝে ব্যবধান ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বাস্তব চিত্রে, দাতাদের মনে, গ্রহীতাদের মনে ও পদ্ধতিতে।

একুশ. ইলমের জন্য যারা মেধা ও সময় ব্যয় করছেন তারা জুমার বয়ানে, ওয়াজ মাহফিলে, টিভির পর্দায়, ইসলাহী বয়ানে, দাওয়াতের বয়ানে এমনকি দোয়ার মাহফিলে কোন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন, কোন

শব্দাবলী ব্যবহার করবেন এবং কোন পদ্ধতিতে বলবেন, এসব কিছু নির্ধারণ করতে হচ্ছে শ্রোতার মর্জির প্রতি লক্ষ্য রেখে। কুরআন ও হাদীসের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী, সময়ের সবচাইতে জরুরী দাবি অনুযায়ী কী বলা দরকার তা নিয়ে ভাবার কোন সুযোগ নেই। আর এ সকল দুর্বলতাকে ঢেকে দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে হেকমত ও কৌশল নামক একটি পর্দা, যার আড়ালে সবকিছুর বৈধতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বাইশ. দোয়া মোনাজাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে কী চাওয়া হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার মোনজাতকারীর হাতে নেই। বিশ্বের মজলুম মুসলমানের জন্য দোয়া করার অধিকার নেই, মুসলমান বন্দীদের জন্য, মুজাহিদদের জন্য দোয়া করার অধিকার এমনকি দেশের শান্তির জন্য দোয়া করার অধিকার নেই; কারণ এতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, দেশে শান্তি নেই। আর এমন রাষ্ট্র প্রধানের হাতে দেশ পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে শান্তি নেই এমন সন্দেহ করা বেয়াদবি এবং রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

অপর দিকে দোয়া করতে হবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহকে তাঁর রাসূলকে যারা গালাগালি করেছে তাদের জন্য। না হয় চাকুরী চলে যাবে, মামলা হবে, নয় তো কমপক্ষে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

তেইশ. মেধা ও সময়ের যোগানদাতারা দাতাগোষ্ঠীকে খুশী করার জন্য নিম্নোক্ত ভয়ংকর ঘটনাগুলো অহরহ ঘটিয়ে চলেছে। দু'টি দাতাগোষ্ঠী গরু জবাইয়ের জন্য টাকা দিয়েছে। উভয়গোষ্ঠীর শর্ত গরু জবাই করা অবস্থার ছবি তাদেরকে দেখাতে হবে, সঙ্গে তাদের ব্যানার থাকতে হবে। দ্বীন ও শরীয়তের যিম্মাদারগণ গরু কিনেছেন একটি। উভয় দাতাগোষ্ঠীকে তাদের ব্যানারসহ গরু জবাইয়ের ছবি সরবরাহ করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন-

এক পক্ষের ব্যানার প্রস্তুত করে ব্যানারের সামনে গরু জবাই শুরু হয়েছে। একটি রগ কেটে রক্তক্ষরণ শুরু হওয়ার পর ব্যানারসহ গরু জবাইয়ের দৃশ্য ছবি করা হয়েছে। এর পর কিছুক্ষণের জন্য জবাই বন্ধ। অপর পক্ষের

ব্যানার সামনে এনে যথাস্থানে রাখা হয়েছে এবং বিরতির পর আবার জবাই শুরু হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যানারসহ গরু জবাইয়ের দৃশ্য ছবি করা হয়েছে। এক গরুর জবাইয়ে উভয় দাতাগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি অর্জনের এ হেকমতপূর্ণ (?!) পর্ব শেষ হয়েছে।

পরবর্তীতে দেখা গেল, এত হেকমত (?) গ্রহণ করার পরও ছবি তোলার মেশিন ভাল ব্যবহার করেনি। ছবি ভলো আসেনি। দাতাগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। ভালো মেশিন আনা হল এবং গরু জবাইয়ের দৃশ্য ধারণ করার জন্য আবার শ্যূটিং করা হল। জবাইকৃত গরুর গলায় আবার ছুরি ধরে জবাইয়ের দৃশ্য ধারণ করা হল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কিন্তু এসবই করা হয়েছে দ্বীনের জন্য! দ্বীনকে কুরবান করে, শরীয়তের গলায় ছুরি চালিয়ে। কারণ, চাঁদার অবৈধ পথ গ্রহণ করার কারণে প্রথমত আমাদের এ সৎ সাহস নেই যে, দাতাকে বলব, আমাদের গরুর প্রয়োজন একটির, আর তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনি চাইলে অন্য বাবদ টাকা দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত আমাদের বলার সাহস নেই যে, আমাদেরকে বিশ্বাস না হলে টাকা দেয়ার প্রয়োজন নেই। মাদরাসার স্বাভাবিক নিয়মে টাকা দেবেন রসিদ নিয়ে যাবেন। তৃতীয়ত আমাদের বলার সাহস নেই যে, এভাবে মুচলেকা দিয়ে আমরা টাকা গ্রহণ করি না।

আমাদের ইসলাহ, বাইয়াত, খিলাফাত, কুরআন-হাদীস চর্চা, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের দাবি কোনটিই আমাদেরকে এ বিষয়টি তাহকীক করার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারছে না যে, কতটুকু প্রয়োজনের জন্য কতটুকুর অনুমতি আছে? দ্বীনের কোন অঙ্গের জন্য কোন অঙ্গ কেটে ফেলছি? যার জন্য করছি তার বাস্তবতা কতটুকু? আর শুধু ধারণা কতটুকু?

চব্বিশ. 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সকল ধর্মের মান সমান বিশ্বাসে বিশ্বাসী' মানুষদের নেতাকে সংবর্ধনা জানাতে মানুষের ঢল নেমেছে। শত ভাগ কুফরী আইনের প্রতিষ্ঠাতাদের সিনিয়র নেতাকে স্বাগত জানানোর জন্য মানুষের আনাগোনা চলছে। যে মাদরাসার আঙ্গিনায় প্রতিদিন শেখানো

হয়, আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলাম, এছাড়া অন্য কোন ধর্ম ধর্মই নয় সে মাদরাসার আঙ্গিনায় ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মত সুস্পষ্ট কুফরী বিশ্বাসে বিশ্বাসীদের ট্রাকের বহর প্রবেশ করছে, মুখে মুখে সে কুফরী মিছিল। পাহারা দিতে হবে সে মাদরাসার কর্তৃপক্ষকেই। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বলার অধিকার নেই যে, এটি একটি ইসলামের আঙ্গিনা, এখানে কুফরী মতবাদের সহযোগিতামূলক কোন আচরণ সম্ভব নয়। এ শ্লোগান ও এ বিশ্বাসকে আলিঙ্গন করা সম্ভব নয়। এ অপরাধের সহযোগিতার কোন বৈধতা নেই।

পঁচিশ. মাদরাসার তালিবে ইলমদের অযু-ইস্তেঞ্জা খানা 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' মিছিলকারীদের আনাগোনায় পঙ্কিল। ময়লা উপচে পড়ছে। আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলামের তালিবে ইলমরা তা পরিষ্কার করছে। তাদের দ্বীনী মর্যাদাবোধে আঘাত লাগার কোন সুযোগ নেই। বরং আরো এক কদম এগিয়ে কুফরী মতবাদের সেসব পাতিনেতাদের বর্জ্য পরিষ্কার করার পুরস্কার বা পারিশ্রমিক হিসাবে এক হাজার টাকা গ্রহণ করতেও কোন প্রকার দ্বিধাবোধ হয়নি। তা অকপটে প্রকাশ করতেও কোন প্রকার সংকোচবোধ হয়নি।

ছাব্বিশ. ধর্মনিরপেক্ষ শ্লোগানে মুখোরিত একেকটি ট্রাক ইলমে দ্বীনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছে আর ঢোল-তবলার মাধ্যমে তাদেরকে বরণ করে নেয়ার মহা উৎসব চলছে। ধর্মের ধারক-বাহকদের বিনীত অনুরোধ করার অধিকার নেই যে, ভাই! এটি ইলমের আঙ্গিনা। এখানে একমাত্র ইসলামই সঠিক ধর্ম -এর তালিম চলছে। ঢোল-তবলা দিয়ে এ আঙ্গিনাকে নাপাক করার কোন অধিকার কারো নেই।

সাতাশ. একমাত্র ধর্ম ইসলামের তালিবুল ইলম এবং তাদের এ ধর্মের শিক্ষকরা নামাযে দঁড়িয়েছেন, এরই মাঝে কুফরী আইনের ধারক-বাহকদের মাইক সরগরম। হয়তো তাদের কোন নেতাকে স্বাগত জানানো, নয়তো কোন কর্মীকে বরণ করা, নয়তো বিশেষ কোন ঘোষণা চলছে। একমাত্র আল্লাহকে সেজদাকারীদের এ অধিকার নেই যে, তারা মাখলূককে সেজদাকারীদের মাইক বন্ধ করে দিতে আদেশ করবে বা কমপক্ষে অনুরোধ করবে।

আটাশ. দাতাগোষ্ঠীকে ছবি প্রদান করতে হবে, নয় তারা নারাজ হবে। তাই ছাত্রদের নির্ধারিত পরীক্ষা বন্ধ করে ছবি তোলার আয়োজন করতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের বলার কোন অধিকার নেই যে, ছবি এখন দেয়া সম্ভব নয়। পরে নিতে হবে।

উনত্রিশ. নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী, স্বীকৃত কাফের-হিন্দু, একমাত্র ধর্ম ইসলামের শিক্ষাকেন্দ্রে দান করবে এবং এ দানের বিনিময়ে তার জন্য মিলাদ পড়ে দোয়া করতে হবে। ইসলাম ধর্মের ধারক-বাহকের বলার অধিকার নেই, কোন অমুসলিমের জন্য দোয়া করার অনুমতি নেই। মুসলামানদের দোয়া ও মিলাদের সঙ্গে একজন অমুসলিম মুশরিকের কী সম্পর্ক?

ত্রিশ. প্রকাশ্যে মদ ব্যবসায়ী মাদরাসার জন্য দান করবে। দ্বীনের ধারক-বাহকরা সে দান প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে না। ব্যবসার উন্নতির জন্য দোয়া করতে বাধ্য। প্রতিষ্ঠানের জন্য তার কাছ থেকে টাকা আনতে হবে। তাও আবার আনতে হবে তার মদ্যশালার অফিস থেকে। নাক কুঁচকানোর অধিকার নেই মুসলমানদের সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তিদের। বলার অধিকার নেই, এ টাকা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের ধর্ম আমাদেরকে এ অনুমতি দেয়নি। এ ব্যবসার জন্য আমরা দোয়া করতে পারব না, এটা আমাদের ঈমানের প্রশ্ন।

যাই হোক আর কত বলতে থাকবো! এ তালিকার শুরু আছে শেষ নেই। কিন্তু পরনির্ভরতার প্রতি এ নিঃশব্দ আসক্তি আমাদেরকে এসব কিছু মেনে নিতে বাধ্য করছে। আমরা দেখেও না দেখার ভান করে, শুনেও না শুনার ভান করে এবং বুঝেও না বোঝার ভান করে সয়ে যাচ্ছি, মেনে নিচ্ছি এবং করেও যাচ্ছি। নিজেকে বা কোন কৌতূহলীকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এ বলে যে, এসব দ্বীনের জন্য। আসলে আমরা জানি, এসব দ্বীনের জন্য নয়। আসলে কিসের জন্য তা প্রত্যেকে নিজের বুকে হাত রেখে একটু ভাবলেই আশা করি খুঁজে পাবেন। **নচেৎ দ্বীনের জন্য নিজেকে কুরবান না করে দ্বীনকে কুরবান করার এ পদ্ধতি সত্যিই অভিনব। নতুন আবিষ্কার।**

নয়.
উত্তরণের পথ খুঁজতে হবেঃ

আজ এ কথাগুলো যত তিক্তই হোক, এ বাস্তবতা যত কঠিনই হোক এবং এ সত্যের স্বীকৃতি যত ঝুঁকিপূর্ণই হোক, এ ঝুঁকি আমাদেরকেই নিতে হবে। একজন দেওবন্দীকেই এ কথাগুলো বলতে হবে। একজন কাসেমীকেই এ বাস্তবতা তুলে ধরতে হবে। একজন তাসাওউফের ভক্ত, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি আন্তরিক, ইলমের ময়দানে বিচরণকারী এবং শুদ্ধ রাজনীতির প্রত্যাশীর মুখ থেকেই কথাগুলো বের হতে হবে। ঘরের লোকেরাই কথা বলতে হবে। **সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার গণ্ডিতে আবদ্ধ করতে হবে।** ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করা এবং শুদ্ধকে আরো এগিয়ে নেয়া এসবই আমাদের দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব **জামায়াতে ইসলামী বা মওদূদীবাদকে** দেয়া যাবে না, যারা ইসলামের মূলকে শাখা এবং শাখাকে মূল বানিয়ে ছেড়েছে। বিভিন্ন ইবাদাতকে ও আবেদগণকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছে এবং ইসলামের উৎস-মূলকে সন্দেহযুক্ত করে তোলার অপচেষ্টা করেছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দিতে দিতে এক পর্যায়ে গণতন্ত্রের কুফরী জালে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং মিছিল, মিটিং ও নির্বাচনকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করে জিহাদকে সন্ত্রাস বলে দ্বীন কুরবান করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে চলেছে।

এ দায়িত্ব গায়রে মুকাল্লিদদেরকে দেয়া যাবে না, যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। যারা দলিলনির্ভর বিষয়াবলীকে অস্বীকার করতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করে না। নিজের মতের বিপক্ষের যে কোন হাদীসকে জাল বলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যাঁদের আমলকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাকে তারা বিদআত বলে আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করে না। যারা নিরক্ষর মুসলমানদেরকে মুজতাহিদের নির্দেশনার আলোকে কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ থেকে বের করে এনে সরাসরি তার অনুসরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পছন্দ করে, চাই তারা আয়াত ও হাদীস বুঝতে পারুক আর না পারুক। যাদের কাছে ঈমানের বিষয়ের তুলনায় 'আমীন' আস্তে বলা বা

জোরে বলার মাসআলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যাদের কাছে বেনামাযীকে নামাযী বানানোর চাইতে রুকূর আগে-পরে হাত না তোলার কারণে মসজিদ ভাগ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইরতিদাদের ফেতনা যাদের মাথা ব্যথার কারণ নয়, মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালিমা। এমনসব বিকৃত মানসিকতার লোকদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধিকে ন্যস্ত করা যাবে না।

এ দায়িত্ব বেদআতীদেরকে দেয়া যাবে না। দেওয়ানবাগী, আটরশি, চন্দ্রপাড়া, মাইজভাণ্ডারীদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির এ দায়িত্ব দেয়া যাবে না যারা স্বপ্ন, কাশফ ও মোরাকাবাকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসকে ধোঁকা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

যারা মনে করে, কুরআন-হাদীসের ইলমের কারণে কলবে দাগ পড়ে যায়, আর বাতেনী ইলম দিয়ে তা মুছতে হয়, তাদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া যাবে না। যাদের কাছে আল্লাহর চাইতে নবী বড়, নবীর চাইতে খাজা বড় এবং খাজার চাইতে নিজের শায়খ বড়। যাদের ইবাদত মাফ হয়ে গেছে, হারাম-হালালের ব্যবধান শেষ হয়ে গেছে, সকল ধর্মের মান এক হয়ে গেছে, যারা সরাসরি আল্লাহর পরামর্শে চলে তাদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া যাবে না। আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে।

এ দায়িত্ব ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী দ্বীনের ধারক-বাহক হওয়ার দাবিদারদের হাতে দেয়া যাবে না যারা إن الدين عند الله الإسلام (আল্লাহ তায়ালার নিকট ইসলামই একমাত্র ধর্ম) কে বিশ্বাস করে না। যারা ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه (ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন কেউ গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবূল করা হবে না) কে বিশ্বাস করে না। যারা জাতীয়তাবাদ তথা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যাদের কাছে ভাস্কর্য ও মূর্তি অত্যন্ত শোভনীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক, যাদের দৃষ্টিতে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী রহ. ও ইসমাঈল শহীদ রহ. এর বালাকোটের যুদ্ধ এবং একাত্তরের যুদ্ধ এক। যে যুদ্ধে হিন্দু-বৌদ্ধকেও শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

যারা মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে বিশ্বাস না করে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে বিশ্বাস করে তারা নির্দ্বিধায় আল্লাহর এ আদেশকে অস্বীকার করে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের মোকাবেলায় কুফরকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। [সূরা তাওবা ২৩]

যারা মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য বিশ্বের কাফের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। আর আল্লাহর এ আয়াতকে অনায়াসে অস্বীকার করে যায়-

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

অর্থঃ তুমি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালবাসে, হোক না তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা গোত্রীয় লোক। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে 'রূহ' দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবহমান; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। [সূরা মুজাদালা ২২]

যারা কাফেরদের সঙ্গে এবং কুফরী শক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে ইসলামের বিশ্বব্যাপী পবিত্র জিহাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বের চলমান সকল জিহাদী

কাফেলার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দেয়, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয়, সেসব লোকের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

যারা ভ্যাটিকান সিটির পোপ, দালাইলামা, জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বিশ্বের ধর্মগুরুদের সত্যায়ন নিয়ে মুসলমানদের ফরয আমলের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া যাবে না।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যে গুণ কুরআনে বিবৃত হয়েছে-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

অর্থঃ (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।) তাকে অস্বীকার করে বিশ্বের সকল কাফের বেঈমানের সাথে ভালোবাসার দাওয়াত দেয়।

যারা কুরআনের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের

প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তাহলে কেন তোমরা তাদের সঙ্গে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এমন করে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং হাত ও মুখ দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে, আর কামনা করবে যে, তোমরাও কুফরী কর। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন, তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন।
[সূরা মুমতাহিনাহ ১-২]

আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাওয়াত দেয়।

যারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শকে

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

অর্থঃ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন। [সূরা মুমতাহিনাহ- ৪]

অস্বীকার করে নাস্তিক-মুরতাদ-মুশরিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বজায় রাখার দাওয়াত দেয়। যারা الْعَدَاوَةُ ও وَالْبَغْضَاءُ এর অর্থ করে মুহাব্বত ও ভালবাসা দিয়ে, তাদের হাতে আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া যাবে না। আমাদের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। কারণ এত কিছুর পরও আজো আমাদের আশার আলো জাগে।

দশ.

আশার আলোঃ

যে আশার আলোটুকু আজও আমরা দেখতে পাই তা আমাদের সামনে পথ চলার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। এত দুর্বলতা, এত পশ্চাদপদতার গ্লানী মাথায় নিয়েও যে বিষয়গুলো আমরা দাবি করতে পারি এবং প্রতিপক্ষের সামনে তুলে ধরতে পারি তা হচ্ছে-

- ওলামায়ে দেওবন্দই ইলম ও আমলের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রচেষ্টা ব্যয় করে যাচ্ছেন।

- ওলামায়ে দেওবন্দই যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস তথা শরীয়তের দলিল-প্রমাণকে সামনে রাখেন। সে আলোকে ফাতওয়া দেন।

- দ্বীনের উপর প্রকাশ্য কোন আঘাত আসলে আজো ওলামায়ে দেওবন্দই তার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন।

- বাতিল মতবাদগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য ওলামায়ে দেওবন্দই সাধ্যানুযায়ী তার মোকাবেলা করেন।

- যাদের ব্যাপারে মনে করা হয়, তারা যাকাত- ফিতরার টাকা খেয়ে বড় হয় তাই তাদের দিল মরা হয়, তারাই মূলত কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে নগণ্য হলেও কিছু বলে চলেছে এবং কিছু করে চলেছে। কারণ যাকাত- ফিতরার টাকা আখের যাদের জন্য হালাল তারাই খাচ্ছে। এতে মহা দোষের কিছু নেই।

পক্ষান্তরে যারা সরকারের মদদপুষ্ট, ইহুদী-খ্রিস্টানদের মদদপুষ্ট, অজানা হাতের দ্বারা পরিচালিত, তারাতো হালালের গণ্ডি বহু আগেই পার করে ফেলেছে। ফলে তাদের সকল প্রকারের আন্দোলন ও প্রতিবাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে হয়ত বেতন বাড়াতে হবে, নয়ত দশ তারিখের আগে আগে বেতন দিতে হবে, নয়ত আবাসিক বাসা দিতে হবে, নয়ত ঈদে বোনাস দিতে হবে, নয়ত বিগত দিনের চুরি মাফ করে দিতে হবে, নয়ত ছুটি এক দিন

বাড়িয়ে দিতে হবে, নয়ত বর্ষাকালে ছাতা দিতে হবে, নয়ত শীতকালে সোয়েটার দিতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যারা নিজেদেরকে অত্যন্ত শিক্ষিত মনে করেন, খুব সচেতন মনে করেন, স্বনির্ভর মনে করেন, তাদের জীবনের সর্বোচ্চ দাবি-দাওয়া হচ্ছে, এ বিষয়গুলো বা এর চাইতে নিম্ন মানের বিষয়। জীবনের সর্বোচ্চ স্বপ্ন হচ্ছে এ বিষয়গুলো। এর জন্য মিছিল, সমাবেশ, মানববন্ধন করে নিজেদেরকে অত্যন্ত বিপ্লবী মনে করেন। এসব ক্ষেত্রে তারা সামান্য লজ্জা করার প্রয়োজনবোধ করেন না।

যারা কুফরী শক্তির চাকর হিসাবে নাম লিখিয়েছে, কুফরী সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে, কুফরী আইন ও সংবিধানের সামনে মাথা নত করে সব মেনে নেয়ার জন্য নাকে খত দিয়েছে, কমপক্ষে তারা আমাদেরকে কিছু বলার আধিকার রাখে না। লজ্জা শব্দের অর্থ জানা থাকলে এবং লজ্জাবোধের লেশমাত্র থাকলেও তারা আমাদেরকে কিছু বলার কথা নয়।

এ জন্য বলছিলাম, ওলামায়ে দেওবন্দের ঐতিহ্যের বহুলাংশ বিলুপ্ত হওয়ার পরও যা আছে তা আজো অন্য যে কোন কাফেলার মাথার উপর আছে। আমাদের ক্রটিগুলো আমরা বলার অধিকার রাখি। কারণ আমরা ক্রটিমুক্ত হতে চাই। আমাদের ক্রটি সম্পর্কে এমন কেউ কথা বলার অধিকার রাখে না যাদের কাছে ঈমানের চাইতে দেশ বড়, দেশের চাইতে দল বড়, দলের চাইতে ব্যক্তি বড়, ব্যক্তির চাইতে ব্যক্তির পা বড় এবং পায়ের চাইতে পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল বড়।

আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সামনে ছোট, শরীয়তের দলিলের কাছে ছোট, আমাদের পূর্বসূরিদের কাছে ছোট।

আমরা বিশ্বের কাছে ছোট নই। কোন সম্প্রদায়ের কাছে ছোট নই। যারা ইহুদী-খ্রিস্টানদের কাছে ঈমান বিক্রয় করে আমাদেরকে তাওহীদের সবক শেখাতে আসে আমরা তাদের কাছে ছোট নই। যারা নিজের দু'দিনের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের শক্তি ও সম্পদকে কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছে আমরা তাদের কাছে ছোট নই। যারা এ দেশ থেকে

সব সম্পদ লুট করে নিয়ে আমাদেরকে চুরি না করার জন্য নসীহত করে আমরা তাদের কাছে ছোট নই। যারা জনগণের কষ্টের টাকা লুট করে, ঋণখেলাফী করে, বরাদ্দের ষাট ভাগ নিজের পকেটে ভরে, বালু-মাটির ঢালাই দিয়ে ইট-সিমেন্টের বিল আদায় করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে আমরা তাদের কাছে ছোট নই।

কিন্তু আমরা তুলনামূলক বড় হওয়াকে যথেষ্ট মনে করি না। কুরআন-হাদীসের সঠিক মানদণ্ডে আমরা উত্তীর্ণ হতে চাই। আকাবিরে উম্মত তথা সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের নির্দেশনা মেনে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সঠিক অনুসারী হতে চাই। আমরা আমাদের মূল দায়িত্বের উপলব্ধি চাই, কর্মপন্থা চাই, কর্মতৎপরতা চাই, ফলাফলের পানে দৃঢ় পদে ছুটে যেতে চাই। সর্বোপরি ওলামায়ে দেওবন্দের অবদান স্বীকার করে, তাঁদের প্রাপ্য হক আদায় করে আমরা কৃতজ্ঞ উত্তরসূরি হতে চাই।

দূরত্ব যত বেশি গতি চাই তত দ্রুত,
পথ যত বন্ধুর পদক্ষেপ তত দৃঢ়।
ঘোর তমসায় রবি-শশির যোজনা,
আমরা কখনো হেরে যাব না॥
হেরে যাব না ...
হেরে যাব না ...

–ইনশাআল্লাহ

মাকতাবাতুস সিদ্দীক
পান্থনিবাস, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালি